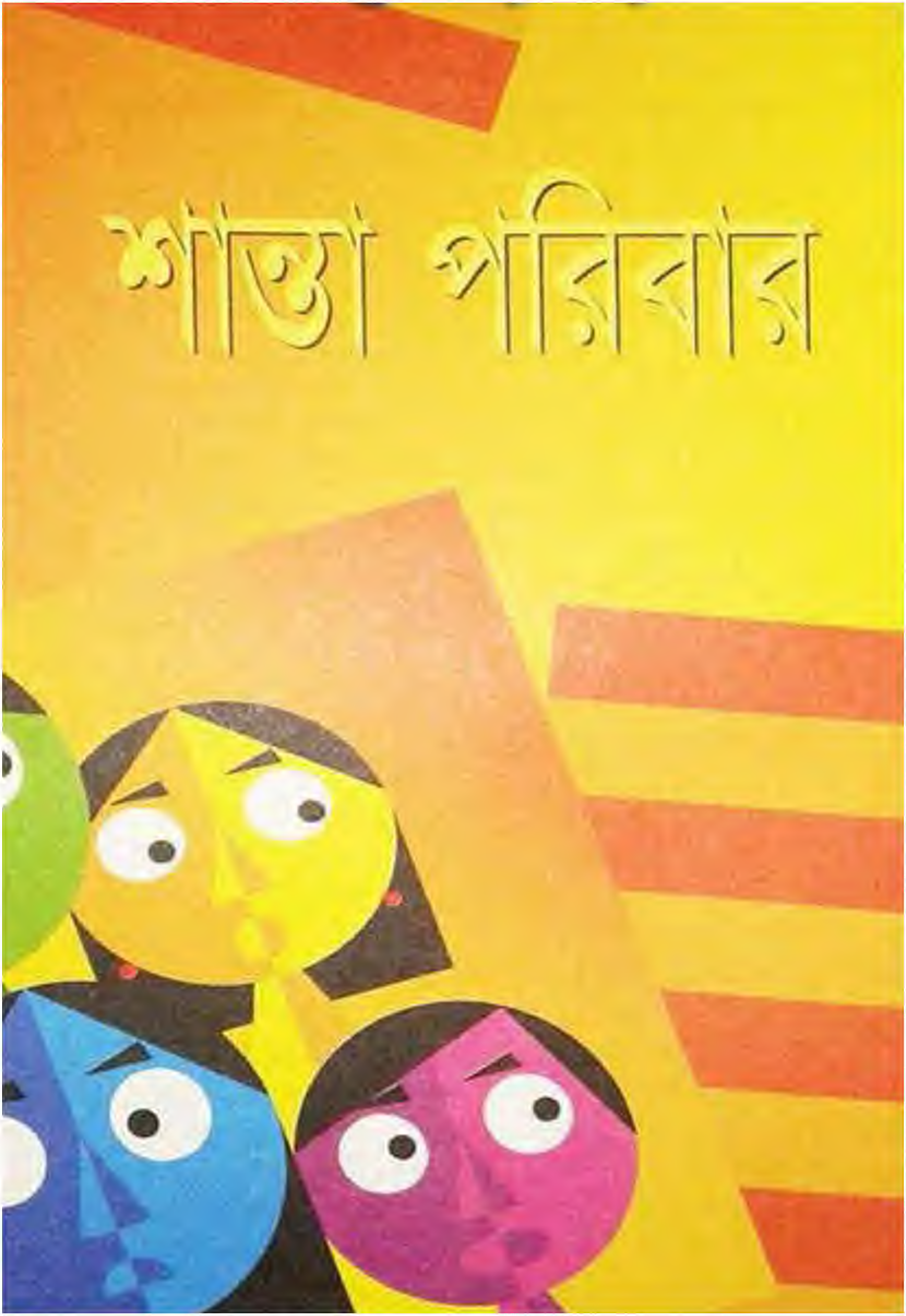
শান্তা পরিবার

শান্তার বয়স যখন মাত্র এক বছর তখন তার বাবা মারা গিয়েছিলেন। শান্তার বাবা ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরির একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, একবার বয়লার ফেটে ফ্যাক্টরিতে ভয়ংকর একটা একসিডেন্টে একসাথে চারজন মারা গেল— সেই চারজনের একজন ছিলেন শান্তার বাবা। একটি বাচ্চা যখন এত ছোট তখন তার বাবা মারা যাওয়া মোটামুটিভাবে একটা ভয়ংকর ব্যাপার, শান্তা অবশ্য তার কিছুই বুঝতে পারল না। শান্তার বাবা বড় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তাই ফ্যাক্টরি থেকে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে শান্তার মা অনেক টাকা-পয়সা পেয়েছিলেন। সবাই তাই শান্তার মা'কে খুব দেখে শুনে রাখল। শান্তার বয়স যখন তিন তখন শান্তার মায়ের খুব একটা খারাপ অসুখ ধরা পড়ল, ব্লাড ক্যান্সার না যেন কী। সেই অসুখে ভুগে ভুগে মা যখন মারা গেলেন তখন শান্তার বয়স চার। মায়ের চিকিৎসা করতে গিয়ে সব টাকা-পয়সা খরচ হয়ে গিয়েছিল তাই মা যখন মারা গেলেন তখন শান্তার জন্যে সবাই শুধু মুখে আহা উহু করেই সরে পড়ল— যখন শান্তাকে মানুষ করার সময় হল তখন কারো দেখা নেই। যখন সবাইকে ধরে বেঁধে আনা হল তখন বড় চাচা আঁৎকে উঠে বললেন, "আমি কী করে এই মেয়েকে দেখাশোনা করব, আমার এমনিতেই এত বড় ফ্যামিলি।" ছোট চাচা চোখ কপালে তুলে বললেন, "সর্বনাশ! আমার এত ছোট ফ্যামিলি এখানে তো এডজাস্টই করতে পারবে না!" শান্তার খালারা ভয়ের চোটে শান্তার বাসাতেই আসা ছেড়ে দিলেন। মামাদের সুবিধে হল সবচেয়ে বেশি, সবাই দেশের বাইরে তাই কীভাবে ছোট বাচ্চাদের মানুষ করতে হয় তার ওপর লম্বা লম্বা চিঠি লিখেই খালাস। শেষ পর্যন্ত কোন উপায় না দেখে শান্তার সবচেয়ে সাদাসিধে ছোট ফুপুর বাসায় তার জায়গা করে দেওয়া হলো।

ছোট ফুপু শান্তাকে মোটামুটি দেখেশুনে রাখলেন— কিন্তু ছোট ফুপু হিসেবেই, একটা ছোট বাচ্চাকে যে আদর করতে হয় মায়া করতে হয় সেটা তিনি বা তার বাসার কেউ বুঝতেই পারলেন না। ফুপুর বড় মেয়ের জামা ছোট হলে সেটা শান্তাকে পরতে দেয়া হতো, বইগুলো পুরানো হলে শান্তার কপালে জুটত। তার নিজের মেয়ে যেত ভালো স্কুলে শান্তাকে পাঠানো হলো গরিব বাচ্চাদের ফ্রি একটি স্কুলে। খুব ছোট থাকতেই শান্তা বুঝে গেলে যে সে আসলে সবার জন্যে একটা উটকো ঝামেলা—বাবা-মায়ের সাথে সেও যদি মরে যেত তাহলে সবচেয়ে ভালো হতো— কিন্তু সে যখন মরে যায়নি এখন তো আর হঠাৎ করে মরে যেতে পারে না। আর বেঁচে যদি থাকতেই হয় তাহলে খামোখা মন খারাপ করে বেঁচে থাকবে কেন, হাসি-খুশি হয়েই বেঁচে থাকবে।

শান্তা তাই হাসি-খুশি হয়ে বেঁচে থাকল। বাসায় মেহমান এলে সে হাসি-খুশি হয়ে চা নাস্তা তৈরি করে দিতো, ফুপুর ছেলেমেয়ের কাপড় জামা খুব আনন্দ নিয়ে ইস্ত্রি করে দিত, বাসায় কাজের বুয়া না থাকলে সে নিজের থেকেই গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে থালা বাসন ধুয়ে ফেলতো।

এইভাবে শান্তা বড় হয়ে উঠল, সে যে পড়াশোনায় ভাল সেটা সবাই মোটামুটি জানতো কিন্তু কতো ভাল সেটা কেউ পরিষ্কার করে জানতো না। তাই শান্তা যখন যাচ্ছে

তাই একটা স্কুল থেকে এস. এস. সি. পরীক্ষা দিয়ে বোর্ডে মেয়েদের মাঝে ফিফথ হয়ে গেলো তখন সবাই একেবারে ভ্যাবেচেকা খেয়ে গেল। অবাক হওয়ার প্রথম ধাক্কাটা সামলে নেওয়ার পর ছোট ফুপু ভান করতে লাগলেন পুরো কৃতিত্বটাই তার— তিনিই শান্তাকে এমন পড়াশোনা করিয়ে ভাল রেজাল্ট করিয়েছেন। মেয়েদের মাঝে ফিফথ হওয়ার পর তো তাকে আর যাচ্ছেতাই কলেজে দেয়া যায় না— তাই এবারে তাকে মোটামুটি একটা ভাল কলেজেই দিতে হলো। শান্তা কলেজে ঢুকেই ছোটখাটো দুই একটা টিউশনি যোগাড় করে ফেলল, নিজের খরচটা মোটামুটি নিজেই রোজগার করতে আরম্ভ করে দিল।

এইচ. এস. সি. পাস করে সে ইউনিভার্সিটিতে চলে এলো, হলে থেকে পড়াশোনা করতো, ফুপুর সাথে তখনো তার যোগাযোগ আছে কিন্তু সে আর ফুপুর ওপর নির্ভর করে নেই। অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেল, মাস্টার্সেও প্রথম তিনজনের মাঝে একজন। সবাই ভাবল সে বুঝি এখন ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হয়ে যাবে। কিন্তু লেকচারার না হয়ে সে তার ক্লাসের এক বন্ধুকে দুম করে বিয়ে করে ফেলল। শান্তার এই বন্ধুটির নাম শওকত। পড়াশোনায় শান্তা থেকেও ভাল। বিয়ের রাতে সাধারণত সবাই একজন আরেকজনের সাথে মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলে কিন্তু কোনো কথা না বলে শান্তার সে কী কান্না! শওকত তো অবাক— শান্তাকে কাঁদতে দেখা তো দূরে থাকুক কখনোই সে মন খারাপ করতেও দেখেনি। শান্তা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমাকে কিন্তু তুমি কোনদিন কাজ করতে বলতে পারবে না।"

শওকত অবাক হয়ে বলল, "সে কী! তুমি এতো ভাল ছাত্রী, সব স্যাররা তোমার ভক্ত, তুমি তো ইউনিভার্সিটির টিচার হয়ে যাবে।"

শান্তা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে বলল, "ছাই টিচার। আমি টিচার হতে চাই না।"

"তাহলে কী হতে চাও?"

"আমি কিছু হতে চাই না। আমার ছয়টা বাচ্চা হবে আমি শুধু সেই বাচ্চাদের আদর করবো।"

শওকত তোতলাতে তোতলাতে বলল, "ছ-ছ-ছয়টা বাচ্চা?"

"হ্যাঁ। একটাও কম না।"

"কেন? এতগুলো কেন?"

"আমি এই এতটুকু থেকে একা। আমাকে কেউ কোনদিন আদর করেনি, আমার এত ইচ্ছা করতো যে আমার একটা মা আমাকে বুকে চেপে ধরে আদর করুক—"

শওকতের তখন এতো মায়া হল শান্তার জন্যে যে বলার নয়। সে শান্তার মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমাকে কেউ কখনো আদর করেনি?"

"না। সেই জন্যে আমি আমাদের বাচ্চাদের আদর করতে চাই। চব্বিশ ঘণ্টা বুকে চেপে ধরে রাখতে চাই। তাদের জন্যে ফ্রক সেলাই করে দিতে চাই। দোকান থেকে আইসক্রিম কিনে দিতে চাই। স্বরে অ স্বরে আ শিখাতে চাই। আর যখন জ্বর হবে তখন সারা রাত মাথার পাশে বসে থাকতে চাই—একটু পরে পরে থার্মোমিটার দিয়ে দেখতে চাই জ্বর কমেছে কী না।"

শওকত অবাক হয়ে শান্তার দিকে তাকাল, শান্তা আবার ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বলল, "আমার যখন শরীর খারাপ হতো তখন এতো ইচ্ছা করতো কেউ আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিক, আমাকে একটু আদর করুক, কিন্তু কেউ আমাকে আদর করতো না—আমি একা একা বিছানায় শুয়ে ছটফট করতাম।"

শওকত তখন তার মাত্র বিয়ে করা বউকে ছোট বাচ্চাদের মতো আদর করে বলল, "তুমি কোন চিন্তা করো না শান্তা, তোমাকে আর কখনো একা থাকতে হবে না।"

শান্তা চোখ মুছে বলল, "হ্যাঁ। তুমি কখনো আমাকে কাজ করতে বলো না— আমি সারাদিন বসে বসে আমার বাচ্চাদের সাথে খেলব। তারা যখন স্কুল থেকে আসবে আমি তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করব স্কুলে কী হয়েছে। যদি কোন স্যার তাদের বকাবকি করে আমি তখন স্কুলে গিয়ে সেই স্যারের সাথে ঝগড়া শুরু করে দেব।"

শান্তার কথা শুনে শওকত হেসে ফেলল, তাই দেখে শান্তা রেগে গিয়ে বলল, "তুমি ভাবছ আমি ঠাট্টা করছি? আমি মোটেও ঠাট্টা করছি না। আমি তাদের টিকা দিতে নিয়ে যাব, ইনজেকশান দেয়ার সময় যদি আমার বাচ্চা কেঁদে দেয় তাহলে আমিও ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলব—" বলে শান্তা সত্যি সত্যি ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল।

প্রথম প্রথম শওকত ভেবেছিল শান্তার এই কথাগুলো বুঝি একটা বাড়িয়ে চাড়িয়ে বলেছে এই যুগে কী আর কারো ছয়টা বাচ্চা হয়? তার ওপর এতো ভাল ছাত্রী কী কখনো ঘরে বসে শুধু বাচ্চা মানুষ করতে পারে, নিশ্চয়ই কোন না কোন কাজে লেগে যাবে। কিন্তু দেখা গেল শান্তা একটুও বাড়িয়ে বলেনি। ছয়টি পারল না কিন্তু বিয়ের দশ বছরের মাঝে তার চারটি বাচ্চা হয়ে গেলো। বাচ্চাগুলোকে শান্তা যে কী আদর করতো সেটি কেউ না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। এমন কী শওকতকেও স্বীকার করতে হল বাচ্চাদের কীভাবে মানুষ করতে হয় সেই ব্যাপারটি সারা পৃথিবীতে শান্তা থেকে ভাল করে কেউ জানে না। এতগুলো বাচ্চা কাচ্চা শুধু শওকতের একার উপার্জন তবুও ভুলেও শান্তা কোন কাজকর্মের মাঝে গেল না। শওকতকে তখন বাধ্য হয়ে ইউনিভার্সিটির চাকরি ছেড়ে একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি নিতে হল। দেখতে দেখতে বাচ্চারা বড় হয়ে গেল, বড় জন এস. এস. সি. দিয়েছে ছোট জন ক্লাস ওয়ানে। বাচ্চাদের দেখেশুনে রাখতে গিয়ে শান্তার হিমশিম খাওয়ার অবস্থা। শওকত ভাবল শান্তার মাথা থেকে এতদিনে বুঝি ছয় বাচ্চার পোকাটি গিয়েছে ঠিক তখন কথা নেই বার্তা নেই দুম করে শান্তার আবার একটি মেয়ে হয়ে গেল! শান্তার খুশি দেখে কে, মনে হলো এটি মেয়ে নয় শান্তার বুঝি এক ডজন মেয়ে হয়েছে!

আবার সবকিছু গোড়া থেকে শুরু হলো—ছোট বাচ্চার ফিডার বোতল, শুরু করে লাল টুকটুকে জুতো, ছোট ছোট বালিশ প্লাস্টিকের ঝুমঝুমি কিছুই বাকি রইল না। দেখেশুনে মনে হলো শান্তার বুঝি মেয়ে হয়নি বাসায় বুঝি নতুন একটা পুতুল এসেছে আর সবাই মিলে সেই পুতুল খেলছে। আগে শান্তা একা সেই পুতুল খেলতো এখন তার সাথে খেলায় যোগ দিয়েছে তার অন্য সব ছেলে মেয়েরা।

এই কাহিনীর যখন শুরু তখন শান্তার বাচ্চাকাচ্চারা আরো বড় হয়ে গেছে, সবচেয়ে বড় জনের বয়স আঠারো আর পুতুলের মতো ছোট বাচ্চাটার বয়স চার।

শান্তার বড় মেয়ের নাম শাঁওলী, এখন সে ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। শান্তা মাঝে মাঝেই অবাক হয়ে শাঁওলীর দিকে তাকিয়ে থাকে, কেমন করে সেদিনকার এইটুকুন একটা

বাচ্চা দেখতে দেখতে এতো বড় হয়ে গেল সে ভেবে পায় না। শাঁওলী আজকাল যখন শাড়ি পরে ইউনিভার্সিটিতে যায় তখন তাকে রীতিমতো একজন ভদ্রমহিলার মতো দেখায়, শান্তা চেষ্টা করেও তার মাঝে সেই এতটুকুন ছোট মেয়েটাকে আর খুঁজে পায় না।

শান্তার মনে আছে শাঁওলী যখন ছোট তখন সে একদিন বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। কী কারণে সেদিন একাত্তুরের যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে খবর উঠেছে, বিজয় দিবসের ঠিক আগে আগে কীভাবে এই মানুষগুলো কবি-সাহিত্যিক-প্রফেসর- ইঞ্জিনিয়ার-ডাক্তারদের ধরে ধরে খুন করেছে পড়তে পড়তে শান্তা দাঁত কিড়মিড় করে মেঝেতে একটা লাথি দিয়ে বলল, "বদমাইস পাজী মার্ডারার রাজাকারের বাচ্চা রাজাকার।"

শাঁওলী শান্তার মুখের দিকে তাকিলে বলল, "আম্মু, কে বদমাইস পাজী মার্ডারার রাজাকারের বাচ্চা রাজাকার?"

শান্তা খবরের কাগজ খুলে রাজাকারগুলোর ছবি দেখালো শাঁওলী অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে ছবিগুলো দেখল, দেখে কী বুঝলো কে জানে বড় মানুষের মতো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাসায় বেল বেজেছে, দরজা খুলতেই দেখা গেল একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি। মানুষটি দেখেই শাঁওলী চিৎকার করতে করতে বাসার ভিতরে ঢুকে গেল, "আম্মু সর্বনাশ হয়েছে, বদমাইস পাজী মার্ডারার, রাজাকারের বাচ্চা রাজাকার চলে এসেছে—"

শান্তা এসে দেখে যাকে দেখে শাঁওলী ভয়ে চিৎকার করছে তিনি শওকতের চাচা! সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তিন নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন।

সেই ঘটনা নিয়ে এখনো হাসাহাসি হয়, শওকতের চাচা শাঁওলীকে দেখলেই গভীর দুঃখের ভান করে বলেন, "বন্দুক হাতে নিয়ে কত কষ্ট করে দেশের জন্যে যুদ্ধ করলাম— আর আমাকে দেখে বলে রাজাকারের বাচ্চা রাজাকার! কী সর্বনাশা কথা!"

সেই শাঁওলী এখন বড় হয়েছে, শান্তার সাথে তার সম্পর্ক এখন প্রায় বন্ধুর মতো। ইউনিভার্সিটি থেকে এলেই শাঁওলীর সব কথা শান্তার শোনা চাই। কোন স্যার কী পড়িয়েছে, কোন মেয়ে কী পরে এসেছে, কোন ছেলে কী বলেছে সব কিছুতেই শান্তার সমান উৎসাহ। শাঁওলীর স্বভাবও অনেকটা শান্তার মতো হাসিখুশি চালাক-চতুর এবং মায়াবতী। বড় হলে সেও যে শান্তার মতো হবে সে ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নেই।

শাঁওলীর পরের জনের নাম সাগর, তার বয়স এখন চৌদ্দ, গভর্মেন্ট স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। সাগরের ভিতরে একটা দার্শনিক দার্শনিক ভাব আছে। সে যখন ছোট একদিন এসে শান্তাকে বলল, "আম্মু একটা লোক আরেকটা লোকনী এসেছে।"

শান্তা বলল, "লোকনী আবার কী রকম শব্দ? বল একজন ভদ্রলোক আরেকজন ভদ্রমহিলা এসেছেন।"

সাগর মাথা নেড়ে বলল, "উঁহুঁ। একজন লোক আরেকজন লোকনী।"

শান্তা তখন একটা ধমক দিয়ে বলল, "এরকম অভদ্রতা করতে হয় না। বলো ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা।"

সাগর খুব অনিচ্ছার সাথে বলল, "ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা।"

"যাও তাদের বসতে বল গিয়ে, আমি আসছি।"

শান্তা একটু পরে গিয়ে দেখলো বাইরের ঘরের সোফায় কাঠ হয়ে একজন বুড়ো আরেকজন বুড়ি বসে আছে, প্রতি শুক্রবার এরা ভিক্ষে করতে আসে।

শান্তা কখনোই সাগরকে বুঝতে দেয়নি যে কাজটি কোন অস্বাভাবিক কাজ হয়েছে! বড় হওয়ার পরও সাগরের মাঝে এই ভাবটি রয়ে গেছে, অনেক ব্যাপার সে বুঝতে পারে না, না হয় নিজের মতো করে বুঝে। সে কথা বলে কম, যেটা বলে মনে হয় সেটাও অনেক ভেবে চিন্তে হিসেব করে বলছে। সাগরের বন্ধু বান্ধব বেশি নেই, সেটা নিয়ে শান্তার একটু দুশ্চিন্তা রয়েছে। মাঝে মাঝেই সে মাথা নেড়ে বলে, "ইস! সাগরের কপালে যদি একটা ভাল বউ না জুটে তাহলে তার কী যে হবে!"

সাগরের পরের জনের নাম বন্যা, শান্তা মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে তারা কেমন করে বুঝতে পেরেছিল যে এই মেয়েটির নাম হতে হবে বন্যা! সত্যি সত্যি সে বন্যার মতো, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ করে হুড় হুড় করে ছুটে এসে ঝাঁপাঝাঁপি করে সবকিছু তছনছ করে দেয়। একজন মানুষের যে এতো প্রাণশক্তি থাকতে পারে সেটা বন্যাকে না দেখলে বোঝা যায় না। বন্যা যখন প্রথম স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে তখন একদিন স্কুলের প্রিন্সিপাল শান্তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, গিয়ে সে খবর পেল বন্যা নাকি ক্লাসের কোন ছেলেকে সিঁড়ির কোনায় চেপে ধরে এমন পিটুনি দিয়েছে যে ঠোঁট কেটে রক্তারক্তি অবস্থা। শান্তা ছেলেটিকে দেখে হতবাক হয়ে গেল, বন্যার থেকেও সে দেড়গুণ লম্বা, ওজন কম হলেও দ্বিগুণ, এতো বড় একজন ছেলেকে সে কেমন করে এরকম পিটুনি দিল সেটি একটি রহস্য।

প্রিন্সিপালের লেকচার শুনে শান্তা বন্যাকে নিয়ে বাসায় ফিরে এল। কেন মারামারি করেছে জানতে চাইলে প্রথমে খানিকক্ষণ মুখ গোঁজ করে থেকে বলল, "আমাকে টিটকারি দিয়েছে।"

শান্তা জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে টিটকারি দিয়েছে?"

"বলেছে, বন্যা বন্যা
মেথরানী কন্যা
গুয়ের বাল্টি মাথায় লন না–"

শান্তা হাসি চেপে রেখে বলল, "এই জন্যে তুই পিটিয়েছিস?"

বন্যা মাথা নাড়ল।

"সাইজে তোর থেকে ডাবল যদি তোকে উল্টো পিটিয়ে দিতো? তোর নাক ভেঙে দিতো?"

বন্যা মুখে এমন একটা ভঙ্গি করল যার অর্থ কার ঘাড়ে দুইটা মাথা আছে যে আমার সাথে লাগতে আসবে? শান্তা বন্যার চুলে হাত বুলিয়ে বলল, "তুই আমার গুন্ডি বেটি?"

বন্যা মাথা নাড়ল, তার এই বিশেষণে আপত্তি নেই।

"তুই কাউকে ভয় পাস না?"

"নাহ!"

"তোর গায়ে অনেক জোর?"

বন্যা আবার মাথা নাড়ল।

"তার মানে কী জানিস?

"কী?"

"তুই এখন আর কাউকে পিটাতে পারবি না।"

"কেন?"

"যার গায়ে অনেক জোর আর যে কাউকে ভয় পায় না সে হচ্ছে লিডার। সে হচ্ছে নেতা। যে নেতা তার সবাইকে রক্ষা করতে হয়। তার কাউকে পিটাতে হয় না। তুই সবাইকে রক্ষা করবি। কাউকে পিটাবি না।"

বন্যা ভুরু কুঁচকে বলল, "সেটা কেমন করে হয়?"

"হয়। খুব বেশি হলে দেওয়ালে চেপে ধরে চোখ লাল করে একটা ধমক দিবি কিন্তু গায়ে হাত তুলতে পারবি না।"

"যদি আবার আমাকে মেথরানী কন্যা বলে?"

"বললে বলবে।"

বন্যা মুখ গোঁজ করে বসে রইল।

শান্তার নানারকম লেকচারের পরেও প্রথম বছরটা বন্যা একটু মারপিট করেই কাটিয়েছে— স্কুলে ডানপিটে হিসেবে একটু নাম হয়ে যাবার পর অবশ্য আর কোন সমস্যা হয়নি— ক্লাসের ডেপোছেলেরা তাকে আর বিরক্তি করেনি। বন্যার বয়স এখন বারো, এখনো সে মোটামুটি একই রকম আছে, সব সময় হৈচৈ করছে ছটফট করছে, কোন কারণ ছাড়াই সে অন্য সবার সাথে তর্কবিতর্ক করছে। শান্তার ধারণা বন্যার কপালে বিশেষ দুঃখ আছে। বিয়ের পর তার কী অবস্থা হবে সেটা চিন্তা করে তার মাঝে মাঝে হৃদকম্পন শুরু হয়ে যায়।

বন্যার পর হচ্ছে সুমন, তার বয়স এখন আট। এই বয়সেই তার চোখে পাওয়ারফুল চশমা। সুমন হচ্ছে এই পরিবারের সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ, শান্তা তাকে ঠাট্টা করে মাঝে মাঝে সুমনষ্টাইন বলে ডাকে। তার বয়স যখন মাত্র সাড়ে তিন তখন একদিন তাকে দেখা গেল সে বন্যার একটা বই নিয়ে খুব গম্ভীর মুখে বসে আছে। শাঁওলী জিজ্ঞেস করল, "সুমন, তুই কী করিস?"

সুমন গম্ভীর গলায় বলল, "পড়ি।"

"কী পড়িস?"

"টোনাটুনির গল্প।"

শাঁওলী অবাক হয়ে দেখল সত্যি সত্যি বইয়ের যে পৃষ্ঠাটি খুলে রেখেছে সেখানে লেখা টোনাটুনির গল্প। শাঁওলী বলল, "পড় দেখি।"

সুমন গড়গড় করে কয়েক লাইন পড়ে ফেলল। শাঁওলী প্রথমে ভাবল বুঝি মুখস্থ বলে যাচ্ছে, সুমনের অভ্যাস হচ্ছে সবাই মিলে যখন পড়ে তখন গম্ভীর মুখে পাশে বসে থাকে, হয়তো কাছে বসে শুনে শুনে পড়া মুখস্থ করে ফেলেছে। শাঁওলী তখন বইয়ের অন্য অংশ খুলে পড়তে বলল, দেখা গেল সেটাও সে পড়ে ফেলল। তখন সে দৌড়ে শান্তাকে ডেকে আনল, শান্তা এসে তো অবাক।

কেউ পড়াশোনা শেখায়নি, অন্যদের পড়তে দেখে দেখে মাত্র সাড়ে তিন বছরে পড়তে শিখে গেছে দেখে শান্তা তখন তখনই সুমনের জন্যে এক গাদা বই কিনে আনল। চার বছরের আগেই বাসার বাচ্চাদের সব বই সুমন পড়ে শেষ করে ফেলল। এতটুকু বাচ্চা গম্ভীর হয়ে মোটা মোটা বই পড়ে ফেলছে, দেখতে খুব মজা লাগল সত্যি— কিন্তু তাতে

সুমনের একটা ক্ষতি হয়ে গেলো। এই ছোটবেলা থেকেই তার চোখে এই মোটা চশমা। প্রতি বছর তার চশমার পাওয়ার বাড়ছে— কেমন করে সেটা থামানো যায় সেটা নিয়ে এখন শান্তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

এই পরিবারে সবচেয়ে ছোট বাচ্চা হচ্ছে ঝুমুর। তার বয়স চার, সবাই তাকে খুব আদর করে। কথা বলতে শেখার পর তার মুখের এক মুহূর্তের বিরাম নেই। একদিন বাসায় কেউ নেই, শান্তার জ্বর এসেছে, সাথে কাশি। বিছানায় শুয়ে কাশতে কাশতে একসময় উঠে বসল, তখন ঝুমুর ছুটে এসে বলল, "আম্মু তোমার কাশি হয়েছে?"

শান্তা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ মা।"

ঝুমুর গম্ভীর হয়ে বলল, "কাশি হলে পানি খেতে হয়।"

শান্তা মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক বলেছ, কাশি হলে অনেক পানি খেতে হয়।"

মাথার কাছে টেবিলে গ্লাস রাখা ছিল, সেটা হাতে নিয়ে ঝুমুর হঠাৎ ছুটে গেল, বলল, "আমি পানি আনি!"

ঠিক আবার তখন শান্তার কাশির একটা দমক এলো, এর মাঝে এক দৌড়ে ঝুমুর পানি নিয়ে এসেছে, শান্তা গ্লাসটা হাতে নিয়ে এক ঢোক পানি খেতেই হঠাৎ তার মনে হল ঝুমুর এতো ছোট সে পানি আনছে কেমন করে? সে তো পানির বোতল খুঁজে পাবে না, একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোথা থেকে পানি এনেছ, আম্মু?"

"ঐ তো ওখান থেকে।" ঝুমুর অনির্দিষ্টের মতো হাত নাড়ল, তাই শান্তাকে ঝুমুরের পিছু পিছু গিয়ে পানির জায়গাটা দেখতে হলো। শান্তার বাথরুমের কমোডের তলায় যেটুকু পানি জমে আছে সেখান থেকে সে আধগ্লাস পানি তুলে এনেছে।

ঝুমুর যখন বড় হবে তখন তার নির্বুদ্ধিতার এই গল্পটি কীভাবে করা হবে সেটা সবাই মিলে এখন থেকে ঠিক করে রেখেছে!

পরিবারের সবচেয়ে ছোট শিশু ঝুমুর, কিন্তু আসলে সবচেয়ে ছোট কে সেটা নিয়ে মাঝে মাঝেই বাসার সবার মাঝে আলোচনা হয়। বাচ্চাকাচ্চাদের মোটামুটিভাবে সবারই ধারণা যে এই ব্যাপারে তাদের বাবা শওকত সম্ভবত এক নম্বর। খাবার টেবিলে বসে কেউ যদি তার প্লেটে শাকসব্জি মাছ মাংস তুলে না দেয় তাহলে সে শুধু ভাতই খেয়ে উঠে যাবে। দরকারি কাগজপত্র দূরে থাকুক নিজের শার্ট বা গেঞ্জিও কোনদিন নিজে খুঁজে বের করতে পেরেছে তার কোন প্রমাণ নেই। কোন বাচ্চার কোন স্কুলে কবে কখন নিতে হবে সে সম্পর্কে শওকতের কোন ধারণা নেই, শাওলীর বিশ্বাস তারা কে কোথায় কোন স্কুলে পড়ে সেটাও তাদের বাবা ঠিক করে জানে না। এ ব্যাপারে বন্যা আরো এক ডিগ্রি ওপরে, সে বলে বেড়ায় আব্বুকে যদি হঠাৎ করে তাদের নাম জিজ্ঞেস করা হয় সেটিও সে বলতে পারবে না। শওকতকে এটি নিয়ে ঠাট্টা—তামাশা করলে সে দুলে দুলে হাসে, বলে, "এ সবই হচ্ছে তোদের আম্মুর একটা কঠিন ষড়যন্ত্র।"

"কেন আব্বু? আম্মুর ষড়যন্ত্র কেন?"

"আমি কী সব সময় এরকম ছিলাম নাকি? আমি একা একা হলে থেকে মানুষ হইনি? সব কিছু নিজে নিজে করিনি?"

"তাহলে এখন তুমি এরকম লেবদু হয়েছ কেমন করে?"

শওকত মাথা চুলকে বলল, "তোর আম্মু আস্তে আস্তে আমাকে এরকম করে ফেলেছে। সব সময় আমার সবকিছু করে দেয় এখন আমি নিজের থেকে কিছু করতে পারি না।"

সাগর বলল, "তোমার কপাল ভাল আম্মু তোমার সাথে অফিসে যায় না, তাহলে অফিসেও তোমার সব কাজ আম্মু করে দিতো।"

শওকত মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছিস।"

বন্যা তখন তাদের সাদাসিধে আব্বুকে বিপদে ফেলার জন্যে বলে, "বলো দেখি আমার বয়স কতো?"

শওকত তখন সত্যি সত্যি একটু বিপদে পড়ে যায়, মাথা চুলকে বলে, "তুই ভাবছিস আমি বলতে পারব না? একশবার পারব। তোর জন্ম হলো যে বছর খুব বন্যা হয়েছিল সেই বছরে, সেটা হচ্ছে নাইন্টিন–"

বন্যা মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু, হিসেব করে বললে হবে না, একবারে বলতে হবে।"

শওকত কিছু বলার আগেই অন্যেরা হাত তালি দিয়ে আনন্দে চিৎকার করতে থাকে, "পারে নাই! পারে নাই!" বন্যার বয়সটা সাথে সাথে বলতে না পারার কারণে যেরকম আনন্দ হচ্ছে সেটা দেখে শওকতের নিজেরও আনন্দ হতে থাকে।

এই হচ্ছে শান্তা পরিবার।

এরকম সময়ে একদিন সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। মতিঝিলের কাছে একটা গাড়ি একসিডেন্টে শান্তা মারা গেল।

শান্তা মারা যাবে সেটা কেউ বুঝতে পারেনি। সুমনকে নিয়ে সে রিকশা করে আসছিল, মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে পিছন থেকে একটা বাস এসে রিকশাকে ধাক্কা দিল। সেই ধাক্কায় সুমন আর শান্তা প্রায় উড়ে গিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল, শান্তা ব্যথা পেল মাথায় আর কোন একটা বিচিত্র কারণে সুমনের কিছুই হল না। চোখ থেকে শুধু তার চশমাটা খুলে ছিটকে পড়ল। সুমন তার চশমাটা চোখে পরে দেখে তার আম্মু রাস্তায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, তাই দেখে ভয় পেয়ে সে কাঁদতে শুরু করল।

কিছুক্ষণের মাঝেই তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, খবর পেয়ে প্রথমে শওকত। তারপর অন্য সবাই হাসপাতালে চলে এলো। শান্তার জ্ঞান হলো সন্ধ্যেবেলা, তখন ডাক্তাররা হাঁফ ছেড়ে বললেন, "এবারে বিপদ কেটে গেছে, আর কোন ভয় নেই।"

রাত নটার দিকে শান্তা তার সব বাচ্চাদের ডেকে পাঠায়, সবাই এসে তখন তাদের আম্মুকে ঘিরে দাঁড়াল। শান্তা বিছানায় আধশোয়া হয়ে বলল, "সবাই মন দিয়ে শোন, আমি কী বলছি। খবরদার কথা বলার সময় ডিস্টার্ব করবি না।"

সবাই মাথা নাড়ল, বন্যা বলল "ঠিক আছে, ডিস্টার্ব করব না।"

শান্তা একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "আমি মরে যাচ্ছি।"

শাওলী চমকে উঠে বলল, "কী বলছ আম্মু? ডাক্তাররা বলেছে—"

শান্তা হাত তুলে বলল, "কী হল? আমি বলেছি না কথা বলার সময় ডিস্টার্ব করবি না!

তখন সবাই এক সাথে চিৎকার করে বল, "কিন্তু—"

"কোন কিন্তু না। আমাকে কথা বলতে দে। আমি জানি আমি কী বলছি। ডাক্তাররা ধরতে পারেনি। আমি জানি আমি টের পাচ্ছি আমার সময় শেষ হয়ে আসছে।"

শাঁওলী এবং সাগর, বন্যা এবং সুমন চোখ বড় বড় করে তাদের আম্মুর দিকে তাকিয়ে রইল। শুধু ঝুমুর এক ধরনের কৌতূহল নিয়ে তার আম্মুর বিছানাটার দিকে তাকিয়ে রইল, বিছানাটা কীভাবে সোজা হয় এবং বাঁকা হয় সেটা সে বুঝতে পারছে না। তার আম্মুর কোলে বসে সে যদি বিছানাটা নিজে নিজে একবার সোজা করতে পারত আরেকবার বাঁকা করতে পারত তাহলে কী মজাটাই না হতো!

শান্তা বলল, "আমার সব সময় মনে হতো আমি বেশি দিন বাঁচব না। এই জন্যে আমি কোনদিন কোন কাজ করিনি, সব সময় তোদের সাথে ছিলাম। মানুষজন তাদের বাচ্চাদের মানুষ করার জন্যে কত কিছু করে আমি কিছু করিনি। আমি শুধু তোদেরকে আদর করেছি!"

শাঁওলীর চোখে হঠাৎ পানি এসে গেল, সে ভাঙা গলায় বলল, "আম্মু—"

শান্তা আবার হাত তুলে শাঁওলীকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমাকে শেষ করতে দে। এখন কিছু বলিস না। হ্যাঁ যেটা বলছিলাম— তোদেরকে আমি খালি আদর করেছি। আর আমার কী যে ভাল লেগেছে সেটা খালি আমি জানি। বুঝলি— আমি প্রতি মুহূর্তে খোদাকে বলেছি, থ্যাংক ইউ খোদা আমাকে এত আনন্দ দেওয়ার জন্যে। আমার জীবনটাকে সার্থক করে দেওয়ার জন্যে। এখন আমার মরতে কোন দুঃখ নেই। শুধু একটু দুশ্চিন্তা তোরা একলা একলা সব কিছু ম্যানেজ করতে পারবি কী না।"

শাঁওলী এবারে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আম্মু—"

শান্তা ধমক দিয়ে বলল, "খবরদার কাঁদবি না। চোখ মুছে ফেল। মুছে ফেল বলছি—"

শাঁওলী চোখ মুছল, তাই দেখে শান্তা বলল, "হ্যাঁ ভেরি গুড। শোন তাহলে— আমার খালি একটু দুশ্চিন্তা। কিন্তু আমার মনে হয় দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। কারণ আমি এমনিতে থাকব না কিন্তু তোদের ভিতরে তো থাকব। আমার একটা অংশ তো সব সময় তোদের মাঝে থাকবে। থাকবে না?"

কেউ কোন কথা বলল না, সাগর আস্তে মাথা নাড়ল।

"কাজেই তোদের মাঝে দিয়ে আমি বেঁচে থাকব। যেমন সাগরের নাকটা হুবহু আমার নাক, শাঁওলী পেয়েছিস আমার গায়ের রং। বন্যা পেয়েছিস আমার রাগ। আর তোরা নিশ্চয়ই সবাই আমার ভালবাসাটা পেয়েছিস। তোদের সবাইকে আমি এত আদর করছি, এত ভালবেসেছি তার কিছু কী তোদের ভিতরে যায়নি?"

সবাই আবার মাথা নাড়ল। শান্তা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "হ্যাঁ। আমি তো এখন চলে যাচ্ছি তাই আমি বুঝতে পারছি যে আমি যেটা জানি সেটা আর কেউ জানে না। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অর্থটা আমি বুঝতে পেরেছি সেটা তোদেরকে বলে দিই। বুঝলি, সব সময় বাঁচতে হয় অন্যের জন্যে নিজের জন্যে বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই। সব সময় মনে রাখবি অন্যের জন্যে যদি কিছু করতে না পারিস তাহলে সেই জীবনের কোন মূল্য নেই। একটা তেলাপোকার জীবন কিংবা একটা ইঁদুরের জীবনের সাথে তার কোন পার্থক্য নেই। মনে থাকবে?"

এতক্ষণে অন্য সবাই কাঁদতে শুরু করেছে। শান্তা এবারে সেটা না দেখার ভান করে বলল, "আমি যখন চলে যাব, তোরা যখন একা একা থাকবি তখন একজন আরেকজনকে দেখে রাখবি। আর আমার কথা মনে করে কখনো কাঁদতে পারবি না। এতদিন তোদের এত আদর করেছি তার মাঝে তোদের কী কোন আনন্দ দিই নি?

বন্যা কাঁদতে কাঁদতে বললো, "দিয়েছ আম্মু।"

"সেই আনন্দের কথাগুলো মনে করে হি হি করে হাসবি। মনে রাখিস আমি কিন্তু সব সময় তোদের সাথে থাকব। দেখব তোরা কী করিস। দুঃখ পুষে রাখবি না— দুঃখ করার মাঝে কোন বীরত্ব নেই।"

কথা বলতে বলতে শান্তা কেশে উঠল এবং হঠাৎ করে তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠে এল। শান্তা মাথার কাছ থেকে টাওয়েলটা নিয়ে মুখ মুছে ফেলে বলল, "এখন তোরা যা। যাবার আগে একবার আমার কাছে আয়।"

একজন একজন করে সবাই শান্তার কাছে এগিয়ে এল, শান্তা শক্ত করে শেষবার তাদের বুকে চেপে ধরে বলল, "এবারে সবাই যা।"

শাঁওলী শান্তার হাত ধরে থেকে বলল, "আমি তোমার সাথে থাকি আম্মু?"

শান্তা শাঁওলীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভয় পাবি না তো?"

"না, আম্মু ভয় পাবো না।"

"ঠিক আছে, তাহলে তুই থাক আমার সাথে।"

শান্তা শাঁওলীর হাত শক্ত করে ধরে রেখে মারা গেল রাত সাড়ে এগারোটায়। শওকত গিয়েছিল একটা পোর্টেবল এক্স-রে মেশিনের ব্যবস্থা করতে, সে ফিরে এল রাত বারটায়, এসে দেখে তার বাচ্চাগুলো একজন আরেকজনকে ধরে চুপচাপ অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

শান্তা মারা যাবার পর প্রথম কয়েকটি দিন কাটল অনেকটা ঘোরের মাঝে, কেউ যেন ঠিক বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে। সবার মনে হতে থাকে পুরো ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্ন এবং এক্ষুনি ঘুম ভেঙে যাবে তখন সবাই আবিষ্কার করবে আসলে শান্তার কিছু হয়নি টেবিলে নাস্তা সাজিয়ে বিছানা ধাক্কা দিয়ে চিৎকার করে বলছে "এক্ষুণি ঘুম থেকে ওঠ— না হলে বিছানা থেকে ঠেলে ফেলে দেব" কিংবা খপ করে হাত ধরে টেনে নিজের পাশে দাঁড়া করিয়ে বলছে, "দাঁড়া দেখি আমার পাশে, দেখি কত লম্বা হয়েছিস।" কিন্তু কেউ এই দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে না সবাই ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে এটা দুঃস্বপ্ন না, এটা সত্যি— শান্তা আর ফিরে আসবে না।

ঝুমুর এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ঘুরে ঘুরে তার আম্মুকে খুঁজে আর ভাঙা গলায় ডাকে, "আম্মু টুকি-আম্মু টুকি—" শান্তা ঘরের দরজার পাশে লুকিয়ে থেকে হঠাৎ করে "টুকি" বলে লাফিয়ে বের হয়ে ঝুমুরকে চমকে দেবার একটা খেলা আবিষ্কার করেছিল, ঝুমুরের ধারণা শান্তা এখন সেই খেলাটি খেলছে। ঝুমুরকে এভাবে দেখে বন্যা হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকে। শাঁওলী তখন চোখ পাকিয়ে বলে, "কী হল বন্যা—আম্মু কী বলেছিল মনে নেই?"

বন্যা মাথা নাড়ে, তার মনে আছে।

"তাহলে কাঁদছিস কেন গাধা কোথাকার।"

"কী করব আপু—পারি না যে!"

"পারি না বললে হবে না। পারতে হবে।" বলে শাঁওলী নিজেই ঠোঁট কামড়ে প্রাণপণে চোখের পানি আটকানোর চেষ্টা করতে থাকে।

শান্তা মারা যাবার তিনদিন পর ফুলি শওকতের সাথে কথা বলতে এল। ফুলি বাসায় কাজকর্মে সাহায্য করে, মধ্যবয়স্ক চুপচাপ মহিলা এতদিন শান্তা যেটা বলেছে সেটা করে এসেছে। শান্তা মারা যাবার পর প্রথম দু'দিন নিজে থেকে রান্নাবান্না করছে কিন্তু আজ সে কী করবে বুঝতে না পেরে শওকতের কাছে এসেছে। শওকত জিজ্ঞেস করল, "কী খবর ফুলি?"

"খালুজান, বাসায় কিছু নেই।"

"কিছু নেই?" শওকত কেমন জানি অসহায় বোধ করে। এতদিন সব কিছু শান্তা দেখে এসেছে যখন যেটা দরকার কিনে এনেছে, যার যেটা পছন্দ সেটা রান্না করে টেবিলে দিয়েছে। এখন সে কী করবে? শওকত দুর্বলভাবে জিজ্ঞেস করল, "কী কী লাগবে?"

"চাউল, তেল, মাছ শাকসব্জি সবকিছু কিনতে হবে।"

"ও।" শওকত একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে আমি কিনে আনছি।"

শওকত কাগজ কলম নিয়ে লিস্ট তৈরি করতে করতে হঠাৎ করে বুঝতে পারল পৃথিবীটা খুব নিষ্ঠুর। এই মুহূর্তে শান্তা সবাইকে ছেড়ে একা একা কবরে শুয়ে আছে— শান্তার কথা ভেবে শওকতের বুকের ভিতরে কি ভয়ানক এক শূন্যতা, কিন্তু তারপরও তার খিদে পাচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে— তাকে খেতে হচ্ছে ঘুমাতে হচ্ছে। শান্তাকে ছাড়াই তার জীবন, তার বাচ্চা-কাচ্চার জীবন চলতে থাকবে। শওকত একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে ফুলির দিকে তাকিয়ে বলল, "ফুলি-"

"জে, খালুজান।"

"তুমি তো অনেকদিন থেকে এই বাসায় আছ। এখন শান্তা নেই তাই তোমার ওপর দায়িত্ব অনেক বেশি পড়ে যাবে। তুমি সামাল দিতে পারবে তো?"

ফুলি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ইতস্তত করে বলল, "ইয়ে-মানে-"

শওকত তাড়াতাড়ি বলল, "তোমার কাজ অনেক বেড়ে যাবে। ঝুমুরের পিছনেও অনেক সময় দিতে হবে— বাজার-টাজারগুলো ম্যানেজ করতে হবে। তাই তোমার বেতনটাও নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দেবো—"

শওকতের কথা শুনে ফুলির মুখ একশ ওয়াট বাল্বের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, "না খালুজান আমি বেতনের কথা বলি নাই—সেটা যে আপনি দেবেন সেটা তো আমি জানিই। আপনি আর খালাম্মা ফিরিশতার মতো মানুষ— আমি চাইবার আগে আপনারা দিয়েছেন—"

ফুলিকে সুযোগ দিলে সে আরো কিছুক্ষণ কথা বলতো কিন্তু শওকত সুযোগ দিল না, বলল, "তুমি এখন সবাইকে দেখেশুনে রেখো। কখন কী লাগবে আমাকে জানিও। শান্তাকে ছাড়া কীভাবে দিন কাটবে আমি জানি না। কিন্তু উপায় কী?"

ফুলি বলল, "আপনি কোন চিন্তা করবেন না খালুজান।"

কিন্তু দেখা গেল চিন্তার অনেক কারণ রয়েছে। এতদিন শান্তা ঝুমুরকে দেখে রেখেছে, ছোট বাচ্চাদের মানুষ করার ব্যাপারে শান্তা ছিল সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে বড়

এক্সপার্ট— ফুলি সেটা কেমন করে করবে? একদিন ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে শাঁওলী দেখে ঝুমুর ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে। শাঁওলী জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ঝুমুর?"

"খিদে লেগেছে।"

শাঁওলী বলল, "ফুলি খালাকে বলিসনি কেন?"

"বলেছি তো।"

শাঁওলী ফুলিকে ডেকে বলল, "ফুলি খালা ঝুমুরের খিদে লেগেছে তুমি খেতে দাও নি কেন?"

ফুলি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "আমি একজন মানুষ কতো দিক দেখব? কাপড়গুলো ধুয়ে নাড়তে দিয়েছি—"

শাঁওলী এর আগে কখনো ফুলিকে বিরক্ত হয়ে কথা বলতে দেখেনি। আজকাল প্রায়ই সে বিরক্ত হয়ে কথা বলছে। শাঁওলী একটু কঠিন গলায় বলল, "তাই বলে ঝুমুর খিদে পেয়ে কাঁদছে তুমি দেখবে না?"

ফুলি আরো কঠিন গলায় বলল, "কেউ দশ মিনিট পরে খেলে মরে যায় না।"

শাঁওলী কিছুক্ষণ ফুলির মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্রিজ খুলে ঝুমুরের জন্যে খাবার বের করতে থাকে।

ঠিক একইভাবে বন্যা স্কুলে যাবার সময় দেখে তার স্কুলের পোশাক দুটিই ভিজে, রাতে ধুয়ে দিয়েছে এখনো শুকায়নি। বন্যা বলল, "আমি এখন স্কুলে যাব কেমন করে?"

সে ব্যাপার নিয়ে ফুলির খুব একটা মাথা ব্যথা দেখা গেল না, বলল, "বাদলা দিন, কাপড় শুকাতে চায় না।"

শাঁওলী বলল, "তাহলে ধুয়ে দিলে কেন? আর ধুতেই যদি হয় একটা ধুতে—"

ফুলি ঠোঁট উল্টে বলল, "আমার আরো একশো একটা কাজ করতে হয়—এত হিসেব আমি রাখতে পারি না।"

শাঁওলী ভিজে কাপড় ইস্ত্রি করে শুকানোর চেষ্টা করে, কাপড়টা পুরোপুরি শুকায় না, স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে থাকে, বন্যা সেটা পরেই স্কুলে গেল।

খাওয়া নিয়েও সমস্যা দেখা দেয়। শান্তা একেবারে আইন করে রেখেছিল ঘুমানোর আগে সবাইকে এক গ্লাস দুধ খেতে হবে— এই আইনের কোন নড়চড় হয়নি। এখন দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝেই বাসায় দুধ নেই। বন্যা মাছ খেতে পারে না তার নাকি গন্ধ লাগে। সেটা নিয়ে শান্তা সারাক্ষণ বন্যাকে বকাবকি করেছে জোর করে মাছ খাইয়ে ছাড়বে বলে ভয় দেখিয়েছে, জেলের ছেলের সাথে বিয়ে দেবে বলে ঘোষণা করেছে কিন্তু বাসায় যেদিন মাছ রান্না করা হয়েছে তখন সব সময় বন্যার জন্যে আলাদা করে কিছু একটা রান্না করেছে, কিছু না থাকলে একটা ডিম ভাজা। কিন্তু এখন প্রায় রাতেই খাবার টেবিলে শুধু মাছ থাকায় বন্যা ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে উঠে যাচ্ছে। কিছু করার নেই।

ছোটখাট সমস্যা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তবুও সবাই হয়তো সেটাতে অভ্যস্ত হয়ে যেতো কিন্তু তার মাঝে একদিন একটা অঘটন ঘটলো।

ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের মাঝে কী একটা গোলমাল শুরু হয়েছে বলে দুপুরের ক্লাসগুলো বাতিল হয়ে গেছে, তাই শাঁওলী বাসায় তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। বাসায় এসে

দেখে ঝুমুর মেঝেতে বসে আছে তার সামনে মেঝেতেই কিছু মুড়ি ঢেলে দেয়া হয়েছে এবং ঝুমুর সেগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। পুরো দৃশ্যটির মাঝে এক ধরনের ভয়ংকর অবহেলার চিহ্ন। শাঁওলী ঝুমুরকে কোলে তুলে নিয়ে ডাকল, "ফুলি খালা।"

ফুলি রান্নাঘরে কাজ করছিল শাঁওলীর ডাক শুনে বের হয়ে এল, অসময়ে শাঁওলী চলে আসবে বুঝতে পারেনি চেহারার খানিকটা বিব্রত ভাব। শাঁওলী কঠিন মুখে বলল, "ঝুমুরকে মেঝেতে মুড়ি খেতে দিয়েছ কেন?"

ফুলি ব্যাপারটাকে একটা ছেলেমানুষী মজার ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে চাইল, হাসার চেষ্টা করে বলল, "ছোট মানুষ চেয়েছে তাই দিয়েছি।"

"ঝুমুর তোমার কাছে মেঝেতে মুড়ি ছিটিয়ে দিতে বলেছে?"

শাঁওলী ঝুমুরের দিকে তাকাতেই সে মাথা নাড়ল, তার খিদে পেয়েছিল বলে খেতে চেয়েছিল কিন্তু মেঝেতে মুড়ি ছিটিয়ে দিতে বলেনি। ফুলি রুষ্ট চোখে ঝুমুরের দিকে তাকিয়ে অন্য সুরে কথা বলতে লাগল, বলল, "মেঝে থেকে মুড়ি খেলে কী হয়? আমরা কী বাচ্চা মানুষ করিনি?"

"তুমি কীভাবে বাচ্চা মানুষ করেছ সেটা তোমার ব্যাপার। ঝুমুর তোমার বাচ্চা না। ঝুমুর আম্মুর বাচ্চা।"

ফুলি এবার তার অকাট্য যুক্তিটি বড় গলায় জানিয়ে দিল বলল, "কিন্তু আপনার আম্মু তো মানুষ করছেন না। মানুষ করার দায়িত্বটা আমার ঘাড়েই পড়েছে। পড়েছে কী না?"

শাঁওলী কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল, সত্যিই কী তাই? তাদের শৈশব শান্তার আদর দিয়ে ভরে একেবারে টইটুম্বর হয়েছিল আর তাদের সবচেয়ে আদরের পুতুলের মতো ছোট বোনটির শৈশব এই মহিলাটির ইচ্ছে অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করবে?

শাঁওলী ঝুমুরকে বুকে চেপে ধরে বলল, "ফুলি খালা তুমি তো অনেকদিন থেকে আমাদের বাসায় আছ। আম্মু কীভাবে আমাদের মানুষ করেছে তুমি দেখোনি?"

"দেখেছি।"

" তাহলে?"

"আপনের আম্মার মাথা একটু খারাপ ছিল, আপনাদের যেভাবে মানুষ করেছে সেইভাবে বাচ্চা মানুষ করার কথা না।"

শাঁওলীর মনে হল তার মাথার ভিতরে আগুন ধরে গেছে। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে বলল, "কী বললে তুমি ফুলি খালা?"

ফুলি এই কয়দিনে বুঝে গিয়েছে শান্তা মারা যাবার পর এই পরিবারটি পুরোপুরি তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে। সে বাজার করে আনছে, রান্না করছে, ঘরবাড়ি পরিষ্কার করছে। কাপড় ধুয়ে দিচ্ছে। কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছে সত্যি কিন্তু তার টাকাপয়সা উপার্জনের রাস্তাও বেড়ে গেছে। বাজারের পুরো টাকাটা তার হাতে দেয়া হয় কোন জিনিসের কত দাম সে সম্পর্কে এই বাসায় কারো কোন ধারণা নেই সে যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে হিসেব দিতে পারে। এভাবে আর কিছুদিন চললে সে গ্রামে নতুন টিনের ঘর তুলে ফেলবে। ফুলি জানে তার কোন ভয় নেই, শাঁওলী যতই চেঁচামেচি করুক তাকে ছাড়া একদিনও থাকতে পারবে না। তাই শাঁওলীর প্রশ্নের উত্তর দিতে সে ভয় পেলো না, বলল, "আপনি শুনেছেন আমি কী বলেছি।"

"তুমি পরিষ্কার করে বল।"

ফুলি এবারে গলা উঁচিয়ে বলল, "আমি বলেছি আপনের আম্মা বাচ্চা মানুষ করতে জানেন না। আপনাদের ঠিক করে মানুষ করেননি। আদর দিয়ে সবার মাথা খেয়েছেন।"

"সবার মাথা খেয়েছেন?"

"হ্যাঁ। সবাই এত বড় হয়েছে কেউ নিজে থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে খেতে পারে না। আপনের আম্মা আপনাদের সবাইরে অপদার্থ করে দিয়েছেন।"

শাঁওলী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, বিস্ফারিত চোখে ফুলির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ঝুমুরের দিকে তাকাল, বলল, "ঝুমুর।"

"কী আপু।"

"ফুলি খালা বলছে আম্মু নাকি বাচ্চা মানুষ করতে জানেন না।"

ঝুমুরকে এখন ফুলির মায়ের সাথেই বেশি সময় থাকতে হয় এবং এই মহিলাটিকে সে রীতিমত ভয় পেতে শুরু করেছে। কিন্তু শাঁওলীর কোলে বসে সে বেশ নিরাপদ অনুভব করছিল তাই তার মতামতটা দিতে দেরি করল না, ছোট হাতটি ফুলি খালার দিকে নির্দেশ করে বলল, "ধ্বংস হোক। ধ্বংস হোক।"

বাসার আশপাশে দিয়ে অনেক ধরনের মিছিল যায় এবং সেখান থেকে ঝুমুর নানা ধরনের নতুন শব্দ এবং বাক্য শিখছে—"ধ্বংস হোক" তার একটি। বাক্যটি ঠিক ঠিক ব্যবহার করতে পেরে সে বিশেষ আনন্দ পেল।

ঝুমুরের কথা শুনে শাঁওলী ফিক করে হেসে ফেলল। পুরো ব্যাপারটি যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিল সেটা ফুলি নিজেও ঠিক পছন্দ করছিল না— অস্বীকার করার উপায় নেই শাঁওলী মেয়েটার ভাবভঙ্গি একেবারে তার মায়ের মতো— এই বাসায় শাঁওলীকেই সে একটু ভয় পায়। শাঁওলী হেসে ফেলায় পরিবেশটা একটু সহজ হয়েছে মনে করে ফুলি এবারে ব্যাপারটা মিটানোর চেষ্টা করল, জোর করে মুখে হাসি টেনে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু তার আগেই শাঁওলী তাকে থামিয়ে দিল, বলল, "ফুলিখালা, তোমাকে আমি বরখাস্ত করে দিলাম।"

ফুলি কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না একটু অবাক হয়ে শাঁওলীর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী বললেন আপা?"

"আমি বলিনি। ঝুমুর বলেছে, শুনোনি? ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক? তার অর্থ তুমি বরখাস্ত।"

ফুলি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "আমি বরখাস্ত।"

"হ্যাঁ। আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণব তার মাঝে তুমি এই বাসা থেকে বের হয়ে যাবে। আমার আম্মুকে নিয়ে যে এতটুকু খারাপ কথা বলে সে এই বাসায় থাকতে পারবে না। আমার আম্মু হচ্ছে সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে ভাল মানুষ, তাকে কেউ খারাপ বলতে পারবে না।" শাঁওলী ঝুমুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই না ঝুমুর?"

ঝুমুর মাথা নেড়ে এবার হাত উপরের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, "ধ্বংস হোক। ধ্বংস হোক।"

শাঁওলী মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, ধ্বংস হোক।"

ফুলি এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে, কিন্তু শাঁওলীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি চলে যাব?"

"হ্যাঁ। তুমি চলে যাবে। তোমার ছেলে থাকে কচুক্ষেতে— গিয়ে তোমার ছেলেকে পাঠিয়ে দাও। তোমার জিনিসপত্র পাওনা টাকা বুঝে নিবে। তুমি আর এই বাসায় থাকতে পারবে না। আমার আম্মুকে নিয়ে যে এতটুকু খারাপ কথা বলে সে এই বাসায় থাকতে পারবে না। নো নো নেভার।"

ঝুমুর মাথা নাড়ল, বলল, "নেভার।"

ফুলি হতচকিতের মতো শাঁওলীর দিকে তাকিয়ে আমতা করে বলল, "আপনি কী বলছেন আপা। এই বাসা দেখবে কে? কাজকর্ম করবে কে? বাজার করবে কে? রান্না করবে কে?"

"সেটা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। আমি দশ পর্যন্ত গুণব তার মাঝে তুমি বের হয়ে যাবে।" শাঁওলী মুখ শক্ত করে গুণতে শুরু করল, বলল, "এক।"

ঝুমুর শাঁওলীর সাথে সাথে বলল, "এক।"

ফুলি এই প্রথমবার নিজের বিপদটা টের পেল, হঠাৎ করে সে বুঝতে পারল শাঁওলী সত্যিই তাকে বরখাস্ত করে দিয়েছে। খানিকটা দিশেহারা হয়ে বলল, "আপা, আপনি তো এটা বলতে পারেন না। আমি খালু সাহেবের সাথে কথা না বলে যেতে পারি না। আমার একটা দায়িত্ব আছে না?"

শাঁওলী বলল, "তুমি যদি আব্বুর সাথে কথা বলতে চাও তাহলে তোমার ছেলেকে নিয়ে আব্বুর অফিসে দেখা করো। এই বাসায় তুমি আর থাকতে পারবে না। বুঝেছো?"

ফুলি দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল, তখন শাঁওলী বলল, "দুই।"

ঝুমুর উৎসাহে হাততালি দিয়ে বলল, "দুই।"

ফুলি এবারে নরম হয়ে পড়ল, কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "আপা আমি মুখ্যু- সুখ্যু মানুষ কী বলতে কী বলে ফেলেছি সেই জন্যে এতো রাগ করছেন? একটু ভুল হয়ে গেছে, আর হবে না। আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি—"

শাঁওলী বলল, "তিন।"

ফুলি এব্যারে জোর করে চোখে পানি আনার চেষ্টা করে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলল, "গরিব মানুষ আমি, এই চাকরির ওপর ভরসা করে আছি। এখন আমি কোথায় যাব? কী করব?"

শাঁওলী বলল, "তুমি সেটা নিয়ে চিন্তা করো না। বড় ফুপু অনেকদিন থেকে কাজের মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না। তুমি এতদিনের বিশ্বাসী মানুষ তোমাকে খুব খুশি হয়ে নিয়ে নেবে।" শাঁওলী মুখ শক্ত করে বলল, "তোমাকে আমি চাকরি যোগাড় করে দেব। কিন্তু তুমি এই বাসায় আর থাকতে পারবে না।"

ঝুমুর বলল, "চার।"

শাঁওলী বলল, "চার।"

ঝুমুর উৎসাহ পেয়ে বলল, "সাত।"

শাঁওলী বলল, "না, চারের পর হচ্ছে পাঁচ।"

ঝুমুর বলল, "পাঁচ।"

ফুলি অনেক অনুনয়-বিনয় করল, যুক্তিতর্ক দেখাল কিন্তু শাঁওলী কোন কথা শুনল না। ফুলি শেষ পর্যন্ত রান্না ঘরে যে রান্নাটুকু চাপিয়েছে সেটা শেষ করে যেতে চাইল— শাঁওলী তাকে সেই সুযোগটাও দিল না। তার আম্মুকে নিয়ে যে এতটুকু অসম্মানজনক কথা বলবে তাকে সে এই বাসায় রাখতে পারে না।

দুপুরবেলা অন্য ভাইবোন ফিরে এসে খবর পেল ফুলি খালাকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে। পুরো ঘটনাটুকু শুনে বন্যা মুখ শক্ত করে বলল? "ফুলি খালার কপাল ভাল যে আমি ছিলাম না।"

শাঁওলী জিজ্ঞেস করল, "কেন, তুই থাকলে কী করতি?"

"এক ঘুষিতে নাক ফাটিয়ে দিতাম"

শাঁওলী চোখ বড় করে বলল, "ছিঃ। এটা কী রকম কথা? বড় মানুষকে নিয়ে এইভাবে কথা বলে—"

"কতো বড় সাহস ফুলি খালার, আম্মাকে নিয়ে আজে বাজে কথা বলে?"

"বলেছে বলুক। তাই বলে তুইও বলবি নাকি?"

বন্যা মুখ গোঁজ করে বসে রইল, সাগর, একটু ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু এখন রান্না করবে কে? বাসন ধুবে কে?"

শাঁওলী মুখ শক্ত করে বলল, "সবাই মিলে করতে হবে।"

ঝুমুর হাত তালি দিয়ে বলল? "কী মজা হবে, তাই না আপু?"

শাঁওলী মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, অনেক মজা হবে।"

সাগর ঝুমুরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আর ঝুমুরকে কে দেখবে?"

"সবাই দেখবে।"

"কিন্তু আমরা যখন স্কুলে যাব, তুমি যখন ইউনিভার্সিটি যাবে?"

শাঁওলী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "দরকার হলে আমি ইউনিভার্সিটিতে যাব না। এমনিতেই ক্লাস-ট্লাস বেশি হয় না। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিলেই হবে।"

কেউ কোন কথা বলল না, সবাই জানে তাদের শাঁওলী আপু পড়াশোনায় খুব ভাল, সে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতেই যাবে না সেটা বিশ্বাস হয় না। শাঁওলী বেশ সহজ গলায় বলল, "বুঝলি, ঝুমুরকে ফুলি খালার হাতে দেয়াটাই ভুল হয়েছিল। মনে আছে আম্মু আমাদের কতো আদর করতো?"

সবাই মাথা নাড়ল।

শাঁওলী বলল, "ফুলি খালা কী কখনো সেরকম আদর করতে পারবে? পারবে না। আম্মু নেই বলে ঝুমুরের তো অযত্ন হতে পারে না। ঝুমুরকে আমারই দেখতে হবে।" কেউ কোন কথা না বলে শাঁওলীর দিকে তাকিয়ে রইল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা বাসায় এসে শওকত দেখতে পেলো তার সব ছেলেমেয়ে মিলে হৈচৈ করে টেবিলে থালা প্লেট খাবার দাবার আনছে। দরজায় সাতটা এ ফোর সাইজের কাগজ লাগানো, সেখানে সপ্তাহের সাত দিন কে কি করবে সেটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে লেখা রয়েছে। বাসন ধোয়া, ঘর ঝাড়ু দেয়া থেকে শুরু করে মশারি টানানো এবং ময়লা ফেলে আসা পর্যন্ত সব কাজ ভাগাভাগি করে দেয়া আছে। শওকত নিজের নামও দেখতে পেলো,

প্রতিদিন খাবার শেষে তার নিজের প্লেট নিজে ধুতে হবে, প্রতি শুক্রবারে বাজার করতে হবে এবং মাসে একদিন সবাইকে নিয়ে বাইরে খেতে যেতে হবে। ব্যাপারটা কি জিজ্ঞেস করার আগেই ঝুমুর এসে বলল, "আব্বু ফুলি খালা বরখাস্ত।"

শওকত চোখ কপালে তুলে বলল, "বরখাস্ত?"

"হ্যাঁ।" ঝুমুর গম্ভীর হয়ে হাত উপরে তুলে শ্লোগান দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, "ধ্বংস হোক। ধ্বংস হোক।"

শওকত ব্যাপারটা বোঝার জন্যে শাঁওলীর দিকে তাকাল, শাঁওলী টেবিলে ভাতের ডিশ রেখে বলল, "আব্বু ফুলিখালাকে বিদায় করে দিয়েছি।"

শওকত বিস্ময়টুকু গোপন করে বলল, "কেন?"

"আম্মুকে নিয়ে বাজে কথা বলছিল।"

কী বাজে কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে শাঁওলীর মুখ দেখে শওকত থেমে গেল, দুর্বল গলায় বলল, "ও।"

সবার প্লেটে ভাত তুলে দিতে দিতে শাঁওলী বলল, "ঝুমুরকে ফুলিখালার হাতে ছেড়ে দেয়া একেবারে ঠিক হয়নি। ঝুমুরের খুব অযত্ন হচ্ছিল।"

ঝুমুর মাথা নেড়ে শাঁওলীর কথায় সায় দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, অযত্ন হচ্ছিল।" তারপর খুব গম্ভীরভাবে তার কনুইটি এগিয়ে দিল, "এই দেখো।"

শওকত দেখলো একটা মশার কামড়ের দাগ—অযত্নের এই অকাট্য প্রমাণ দেখে তাকে কয়েকবার মাথা নাড়তে হল। শওকত একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এখন বাসার কাজকর্মের কী হবে?"

শাঁওলী বড় মানুষের মতো বলল, "তুমি চিন্তা করো না আব্বু আমি ম্যানেজ করবো।"

শওকত ভয়ে ভয়ে বলল, "তুই পারবি?"

"পারব না কেন। তুমি খেয়ে দেখো আজকে আমি সব রান্না করেছি।"

শাঁওলীর কথা শেষ হবার আগেই এক সাথে সবাই চিৎকার করে বলল। "তুমি একা রান্না করনি আপু— আমরাও করেছি—"

শাঁওলী সাথে সাথে জিবে কামড় দিয়ে বলল, "সত্যি কথা। সবাই মিলে রান্না করেছি। বেগুন কেটেছে সাগর, মশলা মাখিয়েছে বন্যা। মাছ ধুয়ে দিয়েছে সুমন, চাল ধুয়েছে বন্যা-"

ঝুমুর শাঁওলীর কাপড় টানতে টানতে বলল, "আমি আপু? আমি?"

শাঁওলী মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, মনে নেই তুই লবণের বাটি এনে দিলি? রান্না করার মাঝে সবচেয়ে বেশি ইম্পরট্যান্ট লবণ। বেশি হলে তিতা কম হলে পানশে।"

ঝুমুর মাথা উঁচু করে শওকতের দিকে যুদ্ধ জয়ের ভঙ্গি করে তাকাল। শওকতকে স্বীকার করতে হল ঝুমুর রান্নাবান্নায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

রাত্রে খাওয়াটা হলো বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ। সবচেয়ে কম যে কথা বলে সাগর সেও স্বীকার করল আজকের রান্না হয়েছে অপূর্ব— ফুলিখালা কখনো এতো ভাল রান্না করতে পারত না।

খাওয়ার পর টেবিল পরিষ্কার করে থালা বাসন ধোয়ার কথা। নিয়ম মাফিক শওকতকে তার প্লেট নিয়ে রান্নাঘরের দিকে গিয়েছে, বন্যা সাবান এগিয়ে দিল শওকত প্লেটে সাবান

মাথাতেই সেটা পিছলে হয়ে গেলো এবং কিছু বোঝার আগেই সেটা হাত গলে নিচে পড়ে গিয়ে একশ টুকরো হয়ে গেলো।

দৃশ্যটি ঘটলো সবার সামনে এবং সেটি দেখে সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল। বন্যা গলা উঁচিয়ে বলল, "আমি আগেই বলেছিলাম, আব্বুকে কোন কাজ দিও না, করতে পারবে না শুধু শুধু ঝামেলা বাড়াবে।"

সুমন গম্ভীর হয়ে বলল, "কিন্তু কাজ শিখতে হবে না?"

সাগর বলল, "একটু দেখিয়ে দেয়া উচিত ছিল।"

শাঁওলী ধাক্কা দিয়ে শওকতকে রান্নাঘর থেকে বের করে দিয়ে বলল, "অনেক হয়েছে আব্বু, তুমি যাও। দিনে একটা করে প্লেট ভাঙলে কোন উপায় নেই।"

ঝুমুর উত্তেজিত হয়ে বলল, "আব্বু কিছু পারে না— আমি লবণের বাটি ভেঙে ছিলাম?"

"না তুমি ভাংনি।"

ঝুমুর উপদেশ দেবার ভঙ্গি করে বলল, "শক্ত করে ধরতে হয় এই যে এইভাবে—"

ঝুমুর একটা প্লেট ধরে দেখালো এবং তখন সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল এখন না সে হাত থেকে প্লেটটা ফেলে আরো একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দেয়।

দরজায় টানিয়ে রাখা সাতটা এ-ফোর কাগজে কাজের তালিকা থেকে শওকতের নামটা কেটে দেয়া হল। সবাই যখন হইচই করে কাজকর্ম করছে তখন শওকত টের পেলো প্লেটটা ভেঙে সে মনে হয় বাচ্চাদের অনেক বেশি আনন্দ দিয়েছে। শান্তা বেঁচে থাকলে না জানি কতোভাবে বাড়িয়ে চাড়িয়ে এই গল্পটি করা হতো।

নিজের অজান্তে শওকত একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল।

বেল বাজার শব্দ শুনে শাঁওলী দরজা খুলে দেখতে পেল শক্ত সমর্থ একজন বয়স্কা ভদ্র-মহিলা এবং তার পিছনে আঠারো-উনিশ বছরের একজন ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রমহিলা রেল ইঞ্জিনের মতো ফোঁস করে একটা শব্দ করে শাঁওলীকে ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন। ছেলেটি বাইরে দাঁড়িয়ে মিনমিন করে বলল, "আমি তাহলে যাই ফুপু?"

"আমার স্যুটকেসটা দিয়ে যা।"

শাঁওলী তখন দেখতে পেলো রাস্তায় একটা স্কুটার দাঁড়িয়ে আছে এবং তার সামনে একটা স্যুটকেস—যার অর্থ এই বয়স্কা ভদ্রমহিলা থাকতে এসেছেন। ছেলেটি টেনে টেনে স্যুটকেসটা ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে কেটে পড়ল। বয়স্কা ভদ্রমহিলা শাঁওলীকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের চারদিকে তাকালেন। তারপর আবার ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঘরের ভেতরের দিকে রওনা দিলেন। এরকম সময়ে যে এসেছে তার নিজের পরিচয় দেবার কথা কিন্তু এই বয়স্কা ভদ্রমহিলা হয় সেটা জানেন না, না হয় তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। কাজেই শাঁওলী বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না।"

এই প্রশ্নে ভদ্রমহিলা বিশেষ বিরক্ত হলেন, প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ক্রুদ্ধ চোখে বললেন, "শওকত কই?"

"অফিসে।"

"কখন আসবে?"

"আসতে আসতে কোনদিন সন্ধ্যা হয়ে যায়।"

মনে হল এই ভদ্রমহিলা প্রথমবার শাঁওলীকে দেখতে পেলেন, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে?"

"আমি শাঁওলী।"

"শওকতের কী হও?"

শাঁওলী একটু অবাক হয়ে বলল, "মেয়ে।"

বয়স্কা ভদ্রমহিলা মনে হল ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন, বললেন, "শওকতের এতো বড় মেয়ে? কই আমাকে তো বলেনি।"

কে বলেনি, কেন বলেনি এবং না বলে থাকলে সেটা কেন অপরাধ শাঁওলী কিছুই বুঝতে পারল না বলে চুপ করে রইল। ভদ্রমহিলা বিষ দৃষ্টিতে শাঁওলীর দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং ঠিক তখন ঝুমুর ভেতর থেকে ছুটে এল। ঝুমুরকে দেখে ভদ্রমহিলা আবার আঁৎকে উঠলেন তেলাপোকা কিংবা মাকড়শা দেখে মানুষ যেভাবে আঁৎকে উঠে অনেকটা সেরকম। খানিকক্ষণ চোখ বড় বড় করে ঝুমুরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এইটা কে?"

কথা বলার ভঙ্গি শুনে মনে হল জিজ্ঞেস করলেন, এটি কী?

শাঁওলী ভিতরে ভিতরে মহা খাপ্পা হয়ে উঠলেও গলার স্বর শান্ত রেখে বলল, "ঝুমুর। আমাদের ছোট বোন।"

ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হলো তার হার্ট এটাক হয়ে যাচ্ছে, খানিকক্ষণ খাবি খাওয়ার মতো করে বললেন, "শওকতের এত ছোট মেয়ে আছে?"

শাঁওলীর এবারে রাগ উঠে গেল, গলার স্বর ঠাণ্ডা করে বলল, "আরো থাকত, আম্মু মারা যাওয়ায় সমস্যা হয়ে গেল।"

"আরো থাকত?"

"হ্যাঁ। আমরা তো এখন পাঁচজন— আম্মুর প্ল্যান ছিল কমপক্ষে এক ডজন। আম্মুর ছেলে মেয়ে খুব ভাল লাগে।"

ভদ্রমহিলা বিষ দৃষ্টিতে শাঁওলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি তো শুনেছিলাম শওকত লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করেছিল।"

শাঁওলী অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে বলল, "আপনি ঠিকই শুনেছেন।" তারপর প্রায় যন্ত্রের মতো বলল, "আপনি নিশ্চয়ই অনেক দূর থেকে এসেছেন, হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম নেন। আমি টেবিলে খাবার দিচ্ছি।"

"তোমাদের কাজের লোকটাকে বলো স্যুটকেসটা আমার ঘরে দিতে। আর শওকতের কাছে খবর পাঠাও।"

"কী খবর পাঠাব?"

"বলো যে তার রাঙা ফুপু এসেছে।"

"ঠিক আছে।"

বাসায় কোন কাজের মানুষ নেই কাজেই শাঁওলী ঠেলে ঠুলে স্যুটকেসটাকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গেল, আব্বুর রাঙা ফুপু নামক ভদ্রমহিলাটিকে শাঁওলীর নিজের ঘরেই থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

ভদ্রমহিলা যখন বাথরুমে গোসল করতে গেল শাঁওলী তখন তার আব্বুকে ফোন করল, বলল, "আব্বু, মস্তো বিপদ।"

শওকত ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে।"

"ডাইনী বুড়ি টাইপের একটা মহিলা এসেছে, দাবি করছে তোমার রাঙা ফুপু।"

শওকত শিষ দেয়ার মতো একটা শব্দ করল। শাঁওলী জিজ্ঞেস করল, "আসলেই তোমার ফুপু নাকি ভুয়া?"

"আসলেই ফুপু—দূর সম্পর্কের তোরা দেখিসনি।"

"আসার পর থেকে খুব আজেবাজে কথা বলছে।"

"কার সম্পর্কে?"

"আমার সম্পর্কে, ঝুমুরের সম্পর্কে আর আম্মুর সম্পর্কে।"

"কী বলেছেন?"

"আমি কেন এত বড় আর ঝুমুর কেন এত ছোট। আম্মু পড়াশোনা জানা মানুষ হয়ে কেমন করে এতগুলো বাচ্চাকাচ্চার জন্ম দিল। এইসব।"

শওকত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "বয়স হয়েছে তো সেজন্যে একটু এক্সেনট্রিক হয়ে গেছেন।"

"উঁহু।" শাঁওলী মাথা নাড়ল, "এক্সেনট্রিক নয় অন্য ব্যাপার আছে।"

"অন্য কী ব্যাপার?"

"আমি জানি না— কিন্তু আব্বু তোমাকে বলে রাখলাম তোমার ফুপু বলে সহ্য করে আছি। যদি আম্মুকে নিয়ে আরো একবার একটা বাজে কথা বলে আমি কিন্তু সহ্য করব না।"

শওকত নরম গলায় বলল, "আহা হা— বয়স্ক মানুষ একটু সহ্য করে নে। অল্প কয়দিনের ব্যাপার।"

দুপুর বেলা সাগর বন্যা আর সুমন স্কুল থেকে ফিরে এসে তাদের আব্বুর রাঙা ফুপুকে আবিষ্কার করল। শান্তা এবং ঝুমুরকে দেখে তিনি যত বিরক্ত হয়েছিলেন এই তিনজনকে দেখে অবশ্যি সেরকম বিরক্ত হলেন না। মুখে জোর করে হাসি টেনে বললেন, "আমি তোমাদের রাঙা দাদু। শওকতকে আমি এই বয়স থেকে দেখে আসছি। শওকত যখন ছোট ছিল এই রকম রোগা পটকা ছিল, নাক থেকে সর্দি পড়তো।"

একটা ছোট বাচ্চার বর্ণনা দেওয়ার সময় নাক থেকে সর্দি বের হওয়ার বর্ণনাটি না দিলে কি হয়? রাঙা দাদু কতদিনের জন্যে এসেছে এখনও কেউ জানে না কিন্তু তারা কিছুক্ষণের মাঝে বুঝে গেল সে যদি সেটা দুই-একদিন থেকে বেশি হয় তাহলে সবাই পাগল হয়ে যাবে। প্রথমত, যে কোন কারণেই হোক রাঙা দাদু শাঁওলী আর ঝুমুরকে দেখতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, তার ধারণা পৃথিবীর যে কোন বিষয় তিনি অন্য যে কোন মানুষ থেকে বেশি জানেন এবং সে কারণে যে কোন বিষয়ে তিনি উপদেশ দিতে পারেন। তৃতীয়ত, এবং যে কারণটা সবচেয়ে বেশি গুরুতর সেটা হচ্ছে রাঙা দাদুর ধারণা এই পরিবারের বাচ্চাগুলোকে ঠিক করে মানুষ করা হয়নি এবং খুব অল্প সময়ে তাদেরকে ঠিক করে মানুষ করে দেয়ার দায়িত্বটা তাঁর। সেটা শুরু করলেন খাওয়া-দাওয়া দিয়ে।

বাচ্চারা দুপুর বেলা স্কুল থেকে এসে খেতে বসেছে, রাঙা দাদু খাবার টেবিলে তাকিয়ে নাক কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "এগুলো কী?"

শাঁওলী বই দেখে "থাই-চিকেন" নামে একটা জিনিস রান্না করেছে সবাই মিলে কাটাকুটি করেছে বলে খেতে যেরকমই হোক সবাই খুব উৎসাহ নিয়ে খাচ্ছিল। বন্যা বলল "থাই চিকেন।"

রাঙা দাদু বললেন, "খালি খালি মুরগিটা নষ্ট করলি? এর মাঝে কয়টা আলু দিলি না কেন?"

শাঁওলী বলল, "থাই চিকেনে আলু দিতে হয় না।"

"তুই কেমন করে জানিস?"

"বই দেখে রান্না করেছি, বইয়ে লেখা আছে।"

রাঙা দাদু চোখ কপালে তুলে বললেন, "বই দেখে রান্না করেছিস? রান্না করতে আবার বই লাগে? আমার এত বয়স হলো কখনো রান্না করতে বই দেখতে হয়েছে?"

সুমন বলল, "আমার মনে হয় বইয়ে লেখা থাকলে ভাল। বই দেখে তাহলে সবাই রান্না করতে পারবে। অনেকটা সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টের মতো।"

রাঙা দাদু চোখ গরম করে সুমনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী হল মুরগির রানটা না চিবিয়ে ফেলে দিলি যে? জানিস না রানের ভিতরে ক্যালসিরাম থাকে।"

সুমন বিজ্ঞানী মানুষ সে উচ্চারণের এত বড় ক্রটিটি সহ্য করতে পারল না, বলল, "ক্যালসিরাম না ক্যালসিয়াম। দুধের মাঝে ক্যালসিয়াম থাকে, কলার মাঝে থাকে— চুনের মাঝেও থাকে।"

রাঙা দাদু বৈজ্ঞানিক বিতর্কের মাঝে গেলেন না, ধমক দিয়ে বললেন, "রানটা ভাল করে চিবিয়ে খা। খাওয়া নষ্ট করছিস কেন?"

সুমন বা অন্য কেউই বুঝতে পারল না, মাত্র ঘণ্টা দুয়েক হল এসে একজন মানুষ কীভাবে তাদের সাথে এরকম গালিগালাজ করতে পারে।

বন্যা খাওয়া শেষ করে উঠে যাচ্ছিল রাঙা দাদু তখন তাকে এটা ধমক দিলেন, বললেন, "কী হল প্লেটে খাবার রেখে উঠে যাচ্ছিস যে? প্লেট পুছে খা।"

"পুছে খাব?"

"হ্যাঁ। এটা কী রকম খাওয়া—কিছুই দেখি শেখায়নি তোদের। শুধু খাওয়া নষ্ট করিস।"

বন্যা কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, আব্বু এলে তাকে নালিশ করে এই মহিলাকে বিদায় করতে হবে।

শওকত বাসায় এলো সন্ধ্যায় পর এবং তখন তারা রাঙা দাদুর একটা বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করল, শওকতের সাথে তার ব্যবহার একেবারে মধুর চাইতেও মধুর। শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথা, খাবার টেবিলে খাবার তুলে দিয়ে সাধাসাধি করা— ব্যাপারটা কী তারা কেউ বুঝতে পারল না। খাওয়া শেষ হবার পর রাঙা দাদু তার স্যুটকেস খুলে একটা ঢাউস এলবাম নিয়ে এলেন। ড্রয়িংরুমে বসে মধুর স্বরে শওকতকে ডেকে এনে বললেন, "বাবা শওকত, দেখে যাও তোর সাথে তো যোগাযোগ নেই তাই সবার ছবি নিয়ে এসেছি।"

শওকত ঢাউস এলবামটা দেখে ভয়ে ভয়ে বলল, "হ্যাঁ রাঙা ফুপু দেখব নিশ্চয়ই। তুমি রেখে দাও, আমি দেখে নেব।"

রাঙা ফুপু খুব মজার কথা বলেছে সেরকম একটা ভাব করে বললেন, "তুই একা একা দেখে কী বুঝবি? কাউকে চিনিস নাকি!"

কাজেই শওকতকে রাঙা ফুপুর সাথে বসতে হল এবং তিনি ঢাউস এলবামটার পৃষ্ঠা উল্টে দেখাতে শুরু করলেন। রাঙা দাদু প্রত্যেকটা পৃষ্ঠার ছবির ধারা বর্ণনা দিতে লাগলেন, "এই যে এটা আমার বড় ছেলে, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। পিছনের বাসাটা দেখেছিস? টাইল করা বাথরুম। দুই ছেলে দুইজনেই জিনিয়াস! আর এইটা হচ্ছে আমার ছোট ছেলে, বিজনেস করে। নতুন বিয়ে করেছে। বেয়াইন বিশাল বড় লোক, দুইটা সাত তালা দালান। জয়েন্ট ফেমিলি কিন্তু কী মিলমিশ দেখলে অবাক হয়ে যাবি! ...."

শাঁওলী টেবিল পরিষ্কার করতে করতে রাঙা দাদুর ধারা বর্ণনা শুনতে শুনতে আব্বুর দুরবস্থা কল্পনা করে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। রাঙা দাদু যেভাবে তার পরিবারের সব মানুষের বর্ণনা দিচ্ছিলেন যে শুনে মনে হতে থাকে যে তাদের পরিবারের সবাই বুঝি চিত্র নায়কের মতো সুদর্শন, মডেল কন্যার মত সুন্দরী, আইনস্টাইনের মতো প্রতিভাবান এবং বিল গেটসের মতো বড়লোক! বর্ণনা শুনতে শুনতে শাঁওলী হঠাৎ করে থমকে গেল, রাঙা দাদু বললেন, "এই হচ্ছে ডলির জামাই জালাল। এই জালাইল্যা হচ্ছে বদমাইসের বদমাইস। এর মত মিথ্যুক, পাজী, ছোটলোক, বেয়াদব, নিষ্ঠুর, বেআক্কেল, বেতামিজ, বেশরম মানুষ দুনিয়াতে নেই। এর সাথে বিয়ে হয়ে আমার মেয়েটা কী কষ্টেই না ছিল, ফুলের মতো আমার মেয়েটার জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।"

কথা বলতে বলতে রাঙা দাদুর গলা ধরে এলো, তিনি শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। শাঁওলী টেবিল পরিষ্কার বন্ধ রেখে পাষণ্ড মানুষটাকে দেখতে গেল একজন পুরুষ এবং মহিলা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, মানুষটির চেহারা ভালমানুষের মতোই— দেখে বোঝার উপায় নেই সে পাজী, ছোটলোক, বেয়াদব বা নিষ্ঠুর বরং পাশে দাঁড়ানো মহিলাটির শক্ত পাথরের মতো মুখ দেখে বুক কেঁপে ওঠে।

শওকত এতক্ষণ রাঙা দাদুর ধারা বর্ণনা ধৈর্য ধরে শুনে যাচ্ছিল একটি প্রশ্নও করেনি পাছে আরো বেশি সময় নেয়, কিন্তু মেয়ে জামাইয়ের এরকম রোমহর্ষক বর্ণনা শুনে সে জিজ্ঞেস না করে পারল না, "কী করেছিল মেয়ের জামাই?"

"কী করেনি? খারাপ ব্যবহার করতো। কিপটে কঞ্জুস—ভদ্রঘরের একটা মেয়েকে যে দেয়া-থুয়া করতে হয় তার মাঝে নেই- আমার ফুলের মতো মেয়েটার বিরুদ্ধে আজে বাজে কথা ছড়িয়ে দিল।"

কী আজেবাজে কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে শওকত থেমে গেল— তাহলে এই ঢাউস এলবাম দেখা শেষ হবে না। রাঙা দাদু নিজে থেকেই বললেন, "জামাইয়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার মেয়ে তার মুখে ঝাঁটা মেরে চলে এসেছে।"

"চলে এসেছে?"

"হ্যাঁ। ডিভোর্স হয়ে গেছে।"

শওকত ভয়ে ভয়ে বলল, "হ্যাঁ, যদি দু'জনে মিলেমিশে না থাকতে পারে তাহলে তো আর কোন উপায় নেই, আলাদা হয়ে যাওয়াই ভাল।"

রাঙা দাদু আবার আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন, "ফুলের মতো মেয়েটি আমার, মুখের দিকে তাকাতে পারি না। বুকটা ভেঙে যায়।"

শওকত সান্ত্বনা দিল, "রাঙাফুপু আপনি মন খারাপ করবেন না। আজকাল ডিভোর্স হচ্ছে আবার বিয়ে হচ্ছে, নতুন করে জীবন শুরু করছে। ভাল একটা ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দেন—"

শাঁওলী দেখতে পেল রাঙা দাদুর মুখ একশ ওয়াট বালবের মত জ্বলে উঠল, শওকতের মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বললেন, "আমিও তো তাই বলি!। কিন্তু মেয়ে আমার রাজি হয় না, বলে পুরুষ জাতের ওপর থেকে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক কষ্ট করে নিমরাজি করিয়েছি— কিন্তু একটা শর্ত দিয়ে দিয়েছে।"

শর্তটি কী শওকত নিজে থেকে জানতে চাইল না কিন্তু রাঙা দাদু তাতে নিরুৎসাহিত হলেন না, বললেন, "মেয়ে আমার শর্ত দিয়েছে মানুষটি ভাল মানুষ হতে হবে। বয়স্ক হোক। বিপত্নীক হোক, আগের পক্ষের ছেলে মেয়ে থাকুক, কিছু আসে যায় না। কিন্তু মানুষটিকে ভাল মানুষ হতে হবে।"

রাঙা দাদু আবার তার এলবামটা শওকতের সামনে মেলে ধরলেন, "এই দেখ আমার ডলি, কোমর ছাড়িয়ে গেছে চুল। উকুন মারা সাবানের বিজ্ঞাপনের জন্য মাডেলিং করতে ডেকেছিল, যায়নি।" রাঙা দাদু পৃষ্ঠা ওল্টালেন, "এই দেখ ডলির হাতের কাজ। নিজের হাতে এই কুশনটা তৈরি করেছে। দেখে মনে হয় বাজারের কেনা। এইটা আমার জন্মদিনে রান্না করেছিল। ইলিশ মাছের দো-পেঁয়াজা একবার খেলে সারা জীবন তার স্বাদ মুখে লেগে থাকবে। এই যে দেখ কী সুন্দর বাটিক তৈরি করেছে।" রাঙা দাদু পৃষ্ঠা ওল্টালেন, "এই যে ডলির গত বছরের ছবি। তখন জামাইয়ের সাথে গোলমাল এই জন্যে মুখটা এতটুকুন হয়ে গেছে। এই যে বন্ধুদের সাথে ডলি, বুকের ভিতরে কী কষ্ট কিন্তু কাউকে বুঝতে দেয় না। এই যে ডলি রান্না করছে। রান্না বান্না ঘর সংসারের কাজে এক নম্বর এক্সপার্ট। এই যে ডলি শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে, মেয়েটা আমার গল্প বইয়ের এক নম্বর পোকা। মেয়ের আমার রুচি খুব ভাল বাংলাদেশের আজেবাজে বই পড়ে না শুধু ইন্ডিয়ান লেখকের বই পড়ে।" রাঙা দাদু আবার পৃষ্ঠা ওল্টালেন, "এই যে ডলি গান শুনছে। গান শোনার জন্যে পাগল। শুধু রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনে আজে বাজে গান শুনে না। এই যে ডলি—"

শাঁওলী বাসনগুলো তুলে রাখতে রাখতে কান পেতে শুনতে পায় রাঙা দাদু ডলির ছবি দেখাতে দেখাতে ধারা বিবরণী দিয়ে যাচ্ছেন। পুরো ঢাউস এই এলবামটা আনাই হয়েছে ডলির ছবি দেখানোর জন্যে। যে ডলির কিছুদিন আগে ডিভোর্স হয়েছে এবং একজন মধ্যবয়স্ক বিপত্নীক আগের পক্ষের সন্তান আছে এরকম ভাল মানুষকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে।

শাঁওলী বাসন ধোয়া বন্ধ করে সাগর আর সুমনের ঘরে গেল, সেখানে টেবিলটা ঘিরে সবাই পড়তে বসেছে। শাঁওলী সাবধানে দরজা বন্ধ করে দিতেই সবাই কৌতূহল নিয়ে শাঁওলীর দিকে তাকালো। শাঁওলী ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সবাইকে চুপ থাকতে বলে আরেকটু এগিয়ে যায়, গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, "রাঙা দাদু কেন এসেছে জানিস?"

সবাই মাথা নাড়ল, বন্যা জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"রাঙা দাদুর ডিভোর্স হওয়া একটা মেয়ে আছে তার নাম ডলি। তার সাথে আব্বুর বিয়ে দেওয়ার জন্যে।"

সাগর শুকনো মুখে বলল, "কী বলছ আপু?"

"সত্যি কথা। রাঙা দাদু আব্বুকে এখন তার মেয়ের ছবি দেখাচ্ছে।"

বন্যা টেবিলে ঘুষি মেরে বলল, "ডাইনী বুড়ি!"

শাঁওলী ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "শ স–স–স–স–স!"

সুমন জানতে চাইল, "আব্বু কী বলছে?"

শাঁওলী হাত নেড়ে উড়িয়ে দিয়ে বলল, "আব্বু কী কিছু বুঝে নাকি? মুখ হা করে শুনছে।"

সুমন ফ্যাকাসে মুখে বলল, "এখন কী হবে?"

ঝুমুর আলোচনাটি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, কী নিয়ে কথা হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারল না, কিন্তু এবারে তার মতামতটি দিতে দেরি করল না। হাত উপরে তুলে বলল, "ধ্বংস হোক। ধ্বংস হোক।"

বন্যা মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক বলেছিস। ডাইনী বুড়ি ধ্বংস হোক।"

শাঁওলী ষড়যন্ত্রীর মতো সবাইকে কাছে ডেকে বলল, "কাছে আয় সবাই মিলে একটা প্ল্যান করতে হবে।"

সুমন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "অপারেশন ডাইনী বুড়ি!"

অনেক চিন্তাভাবনা করে অপারেশন ডাইনী বুড়ির কাজ শুরু হল। কাজটি খুব সহজ—পাঁচ ভাইবোন নিজেদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে পাজী, স্বার্থপর, ছোটলোক, বদমেজাজি, বখে যাওয়া, অপদার্থ ছেলেমেয়ে হিসেবে নিজেদেরকে তুলে ধরবে যেন রাঙা দাদু কোনভাবেই নিজের মেয়েকে এই বাড়িতে শওকতের বউ হিসেবে পাঠানোর কথা চিন্তা না করেন।

নাটকের প্রথম দৃশ্য হিসেবে অভিনয় শুরু করল বন্যা— রান্না ঘরে বাসন ধুতে ধুতে হঠাৎ দুইটা কাচের প্লেট ঝন ঝন করে ভেঙে ফেলল। খাবার ঘরে বসে রাঙা দাদু আঁৎকে উঠলেন, বললেন, "কী হল?"

শাঁওলী শান্তভঙ্গিতে চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "কিছু না।"

"কিছু না মানে?"

"বন্যা মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠে। অমাবশ্যা পূর্ণিমায় একটু বেশি হয়। একটু পরে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

বন্যা অবশ্যি ঠাণ্ডা হওয়ার কোন নিশানা দেখাল না রান্নাঘরে আরো কিছু জিনিস ছুড়ে ফেলে এক ধরনের বিকট আওয়াজ করতে লাগল, অনেকটা জন্তুর মত আওয়াজ। রাঙা দাদু আতংকিত হয়ে বললেন, "কী হচ্ছে?"

"আপনি চুপ করে বসে থাকেন।"

"কেন?"

"যখন খেপে যায় তখন খুব ডেঞ্জারাস। যদি রান্নাঘর থেকে বের হয়ে আসে তখন চোখের দিকে তাকাবেন না।"

"চো–চোখের দিকে তাকাব না?"

"না—" শাওলীর কথা শেষ হওয়ার আগেই বন্যা রান্না ঘর থেকে বের হয়ে এল, চুল এলোমেলো, চোখ-মুখ লাল এবং হাতে একটা মস্ত ছোরা— বন্যার অভিনয় দেখে শাওলী মুগ্ধ হয়ে গেল। দেখতে পেল রাঙা দাদু থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছেন।

শাওলী চাপা গলায় বলল, "রাঙা দাদু, একেবারে নড়বেন না। নড়লেই কিন্তু চাকু বসিয়ে দেবে।"

"কি-কিছু একটা করো।"

"কী করব? এখন ওর গায়ে কী রকম জোর জানেন?"

বন্যা চাকু হাতে পুরো টেবিলটা একবার চক্কর দিল– শাওলীর হাসি চেপে রাখতে গিয়ে দম বের হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু খুব গম্ভীর হয়ে বসে মৃদু গলায় বলল, "বন্যা, আপুমনি, চাকুটা দে।"

বন্যা হিংস্র গলায় বলল, "দেব না।"

"ছিঃ। আপু এরকম করে না। দে চাকুটা।"

বন্যা হঠাৎ আঁ আঁ করে ছুটে এসে টেবিলের মাঝখানে রাখা কয়েকটা কলা আর আপেলের মাঝে চাকুটা গেঁথে ফেলল, রাঙা দাদু ভয়ে একটা চিৎকার করে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। শাওলী বন্যাকে ধরে তার ঘরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। কোন রকমে হাসি চেপে খাবার ঘরে এসে দেখে রাঙা দাদু একেবারে মৃত মানুষের মতো ফ্যাকাসে হয়ে আছেন। শাওলীকে দেখে কিছু বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বের হলো না। শাওলী খুব হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "আজকে ওষুধ খায়নি।"

"ও-ওষুধ?"

"হ্যাঁ। দিনে তিনটা করে ক্যাপসুল খেতে হয়। একেকটা ক্যাপসুলের দাম চব্বিশ টাকা। খেতে ভুলে গেলেই এই অবস্থা।"

"ডাক্তার কী বলে?"

"ডাক্তার বলেছে এর চিকিৎসা হচ্ছে আদরযত্ন। সবসময় দেখে শুনে রাখতে হবে। একজন মানুষ সারাক্ষণের জন্যে দরকার।"

"সারাক্ষণ?"

"হ্যাঁ। সারাক্ষণ।"

বন্যার ঘটনাটা ঘটে যাবার কিছুক্ষণ পর সুমন আবার রান্নাঘরে একটা ভাংচুরের শব্দ করল। শাওলী বিরক্ত হওয়ার ভঙ্গি করে বলল, "কী হচ্ছে সুমন?"

"আমি বাসন ধুতে পারব না।"

"না পারলে ময়লা বাসনে খা। তোকে না করেছে কে?"

"কেন একটা বুয়া রাখতে পার না?"

শাওলী মুখ খিঁচিয়ে বলল, "কেন এই বাসায় বুয়া থাকে না তুই জানিস না? তোদের উৎপাতে থাকে না।"

রাঙা দাদু হৈচৈ শুনে ঘর থেকে বের হয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

শাওলী মহা খাপ্পা হওয়ার ভান করে বলল, "কী রকম পাজী দেখেছেন।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"এই বাসায় কোন বুয়া থাকতে চায় না। কেন থাকে না জানেন?"

"কেন?"

"সবাই এত খারাপ ব্যবহার করে যে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না।"

রাঙা দাদু ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী করে?"

"এই সুমন পাজীটা আগের বুয়ার শরীরে গরম পানি ঢেলে দিয়েছিল।"

রাঙা দাদু আঁৎকে উঠলেন, সুমন রান্নাঘর থেকে বের হয়ে বলল, "আমি কী করব? রাগ উঠলে আমার মাথা ঠিক থাকে না।"

"মাথা যদি ঠিক না থাকে তাহলে নিজের বাসন নিজে ধুবে।"

সুমন মুখ গোঁজ করে একেবারে বখে যাওয়া একটা ছেলের ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে রইল। শাঁওলী তখন সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গি করে বলল, "আর কয়টা দিন সহ্য করে নে তারপর একটা ব্যবস্থা হবে।"

"কী ব্যবস্থা হবে?"

"বুয়ার কাজ করার জন্যে একজন পার্মানেন্ট মানুষ আনা হবে।"

"সেটা কে?"

শাঁওলী খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "আব্বুকে বিয়ে দিয়ে একটা নতুন মা নিয়ে আসব।"

রাঙা দাদু চমকে ওঠে শাঁওলীর দিকে তাকালেন। বললেন, "কী বললে? কী বললে তুমি?"

"ঠিকই বলেছি। বুয়ারা থাকতে চায় না– বিয়ে করা বউ হলে কোথায় যাবে বলেন? রান্নাবান্না করতে হবে, বাসন ধুতে হবে, কাপড় ধুতে হবে। গরম পানি ঢেলে দিক আর আগুনের ছ্যাকাই দিক যাবে কোথায় বাছাধন!"

শাঁওলী খুব একটা মজার কথা বলেছে এরকম ভঙ্গি করে হাসতে শুরু করল। রাঙা দাদু একেবারে হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ শাঁওলীর দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর কেমন জানি দুর্বলভাবে হেঁটে হেঁটে নিজের ঘরে ঢুকলেন। শাঁওলী পিছন পিছনে এলো, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "রাঙা দাদু, আজ রাতে খুব সাবধান।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"বন্যা যেরকম খেপে আছে, রাত্রি বেলা কিছু একটা না করে ফেলে।"

"ও–ওষুধ দাওনি"

"দিয়েছি। কিন্তু সব সময়ে ওষুধে কাজ হয় না।"

রাঙা দাদু কথা না বলে দুর্বলভাবে ঢোক গিললেন। শাঁওলী বিছানায় বসে বলল, "আপনি মুরুব্বী মানুষ— আপনার সাথে একটা পরামর্শ করি।"

"কী পরামর্শ?"

"বাসার অবস্থা তো দেখেছেন। বন্যাটা তো প্রায় পাগল। সুমন হয়েছে একেবারে বখে যাওয়া পাজী ছেলে।" শাঁওলী গলা নামিয়ে বলল, "আমার ধারণা সাগর ড্রাগস নেয়া শুরু করেছে।"

"ড্রাগস?"

"হ্যাঁ ফেন্সিডিল, হেরোইন এইসব।"

"সর্বনাশ।"

"হ্যাঁ। আব্বু কিছু খেয়াল করে না সব দায়িত্ব আমার, একেবারে পাগল হয়ে যাবার অবস্থা। বাসায় কী অশান্তি চিন্তা করতে পারবেন না।"

রাঙা দাদু দুর্বলভাবে মাথা নাড়লেন। শাঁওলী গম্ভীর গলায় বলল, "এই অশান্তিতে থেকে আমি মনে হয় একটা বড় ভুল করে ফেলেছি!"

"কী ভুল করেছ?"

"বিয়ে করে ফেলেছি।"

"বিয়ে? তুমি বিয়ে করে ফেলেছ?"

"হ্যাঁ।"

রাঙা দাদু খানিকক্ষণ অবাক হয়ে শাঁওলীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শাঁওলী মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, কোর্ট ম্যারেজ।"

"ছেলে কী করে?"

"কিছু করে না। বাবা বড় লোক কিন্তু বিয়ের খবর শুনে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।"

"বের করে দিয়েছে?"

"হ্যাঁ।" শাঁওলী নখ দিয়ে দাঁত খুঁটে বলল, "অনেক ভাবনাচিন্তা করে দেখলাম তাকে এই বাসায় তুলে আনি।"

"এই বাসায়?"

"হ্যাঁ। হাজার হলেও বিয়ে করা স্বামী ফেলে তো দিতে পারি না। কী বলেন?"

রাঙা দাদু কোন কথা না বলে বিস্ফারিত চোখে শাঁওলীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। শাঁওলী বলল, "আমি এখনও আব্বুকে বলিনি— কীভাবে বলব ঠিক করতে পারছি না। আপনি কী বলেন?"

রাঙা দাদু খানিকক্ষণ শীতল চোখে শাঁওলীর দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর শুকনো গলায় বললেন, "আমি জানি না বাপু।"

শাঁওলী বলল, "আপনার নাত জামাই ছেলেটা খুব খারাপ না, তবে মেজাজটা খুব গরম। শ্বশুর বাড়িতে তো আর গরম মেজাজ দেখাতে পারবে না। পারবে?"

রাঙা দাদু বেশ কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা মেরে বসে রইলেন তারপর তার ব্যাগ খুলে একটা কাগজ বের করে শাঁওলীর হাতে ধরিয়ে বললেন, "এই নাম্বারে ফোন করে একটা খবর দে।"

"এ কে? কী খবর দেব?"

"আমার ভাগ্নে। বলবি এসে নিয়ে যেতে। বিকেল বেলাতেই যেন আসে।"

"সে কি!" শাঁওলী চেষ্টা করেও আনন্দ গোপন রাখতে পারল না। "আপনি চলে যাবেন?"

"হ্যাঁ। যেতে হবে জরুরি কাজ আছে।"

"জরুরি কাজ থাকলে তো আর কিছু করার নেই—" শাঁওলী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে গেল।

সপ্তাহখানেক পরের কথা। শওকত খাবার টেবিলে বসে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করল, বলল, "রাঙা ফুপুর কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছে।"

খাবার টেবিলের কথাবার্তা হঠাৎ করে একেবারে থেমে গেল বন্যা এবং সুমন, সাগর এবং শাঁওলীর মাঝে চোরা চাহনীর বিনিময় হল। শওকত চিঠিটা খুলে বলল, "আমাকে বুঝিয়ে বল, ব্যাপারটা কী?"

শাঁওলী হাসি চেপে বলল, "কী হয়েছে আব্বু?"

"রাঙা ফুপু লিখেছে, তুই নাকি একজন গুণ্ডাকে বিয়ে করে ফেলেছিস। বন্যা পুরোপুরি পাগল, সাগর ড্রাগস খায় আর সুমন গরম পানি বুয়াদের শরীরে ঢেলে দেয়।"

"আমরা কী জানি আব্বু! তোমার রাঙা ফুপু লিখেছে তাকেই জিজ্ঞেস করো।"

"ফাজলেমি করবি না— কী হয়েছে বল।"

"আমি আবার কখন ফাজলেমি করলাম?" শাঁওলী অন্য সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "করেছি?"

অন্য সবার হাসি চেপে রাখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল এবং বন্যা প্রথমে শব্দ করে হেসে ফেলল এবং তখন আর কাউকে থামানোর কোন উপায় নেই, খাবার টেবিলে পানির গ্লাস উল্টে ডালের বাটি কাত করে হাসতে হাসতে একেকজন গড়াগড়ি খেতে থাকে।

শওকত চোখ পাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে বলবি তো?"

শাঁওলী কোনমতে চোখ মুছে বলল, "কিছু হয়নি আব্বু— তুমি নিশ্চিন্ত থাক আমি কোন গুণ্ডাকে বিয়ে করিনি, বন্যা পাগল হয়নি, সাগর এখনো ড্রাগস খায় না আর সুমনও গরম পানি কারো গায়ে ঢেলে দেয় না!"

"সেটা আমি জানি— কিন্তু এরকম কথা একজন মানুষ লিখবে কেন?"

ঝুমুর হাত নেড়ে চিৎকার করতে লাগল, "বলে দেব, আমি বলে দেব।"

বন্যা একটা ধমক দিল, "চুপ কর পাজী মেয়ে, এক থাবড়া দেব।"

শওকত মাথা নেড়ে বলল, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

শাঁওলী বলল, "তোমার বোঝার কোন দরকার নেই। শুধু জেনে রাখো তোমার উপর মহাবিপদ এসেছিল আমরা সেটা কাটিয়ে দিয়েছি।"

শওকত চোখ বড় বড় করে বলল, "হ্যাঁ, সেটা অবশ্যি ঠিকই বলেছিস, ইয়ে মানে— হ্যাঁ, কিন্তু তোরা আবার মানে—" শওকত কথা শেষ না করে অপ্রস্তুত হয়ে থেমে গেল।

হাসি অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাপার, টেবিলে সবাই আবার হাসিতে গড়াগড়ি খেতে থাকে।

শান্তা যতদিন বেঁচে ছিল বাচ্চাকাচ্চার জন্মদিনগুলো খুব ধুমধাম করে পালন করা হতো। শাঁওলী যে এত বড় হয়ে গেছে এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তার জন্মদিনটিতেও মোমবাতি জ্বালিয়ে কেক কাটা হতো। ঝুমুরের জন্মদিনের কথা তো ছেড়েই দেওয়া যাক—পুরো মাস বাসায় এক ধরনের জন্মদিনের উত্তেজনা থাকত।

এখন শান্তা নেই কাজেই জন্মদিন যে সেরকম ধুমধাম করে হবে সেটা আশা করা যায় না। কিন্তু অন্তত জন্মদিনে যে ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠান হবে সেটা তো আশা করা অন্যায় নয়। কিন্তু বন্যা প্রথমে বিস্ময় এবং পরে এক ধরনের অভিমান নিয়ে লক্ষ্য করল তার জন্মদিনটি চলে আসছে কিন্তু সেটি নিয়ে কারো এতটুকু মাথা ব্যথা নেই। বন্যা যখন বুঝতে

পারল তার জন্মদিনের কথা কারো মনে নেই তখন সে রীতিমত একটা আঘাত পেলো। শান্তা মারা যাবার ব্যাপারটি বন্যা যেন হঠাৎ নতুন করে টের পেলো।

জন্মদিনে ঘুম ভাঙতেই বন্যার মন খারাপ হয়ে যায়। আম্মু বেঁচে থাকলে কানের কাছে মুখ রেখে আম্মু "হ্যাপি বার্থ-ডে" বলে এত জোরে চিৎকার করে উঠত যে বাসার সবার ঘুম ভেঙে যেতো। যত বড়ই হোক না কেন সারাদিন আম্মু একটু পরপর তাকে বুকে চেপে ধরতো, ধ্যাবড়া করে গালে চুমু খেয়ে বসতো আর বন্যা বিরক্ত হয়ে বলতো, "আহ্! আম্মু তুমি যে কী কর!"

কিন্তু আজকে বন্যাকে হ্যাপি বার্থ-ডে বলার কেউ নেই। ঘুম থেকে উঠে বন্যা বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিজে বলল, "হ্যাপি বার্থ-ডে।" বলেই তার কেমন জানি কান্না পেয়ে যায়, চোখ মুছে দাঁত ব্রাশ করে স্কুলের কাপড় পরে সে বাথরুম থেকে বের হয়ে এল। শাঁওলী রান্নাঘরে খুটখাট করে নাস্তা তৈরি করছে। বন্যাকে দেখে হাই তুলে বলল, " কী হল? একটু তাড়াতাড়ি করবি না? এত ঢিলে হলে কেমন করে হবে?"

বন্যা অবাক হয়ে শাঁওলীর দিকে তাকাল, আজ তার জন্মদিন অথচ প্রথম কথাটাই একটা ধমক? সে ঘড়ির দিকে তাকাল অন্যদিনের থেকে একটুও দেরি হয়নি তাহলে খামোখা আপু তাকে ধমক দিল কেন?

নাস্তা করতে বন্যার একটুও ভাল লাগে না কিন্তু তবু জোর করে খেতে হয়। তার সবচেয়ে খারাপ লাগে পরটা লুচি এসব খেতে— বন্যা আবিষ্কার করল শাঁওলী আপু আজকে সবার জন্যে পরটা ভেজে রেখেছে। বন্যা কোন কথা না বলে জোর করে একটা পরটা কোনমতে খেয়ে নিল। ডাইনিং টেবিলে ততক্ষণে সাগর আর সুমনও এসে গেছে, ভোর বেলা খবরের কাগজ দিয়ে গেছে দু'জন হুমড়ি খেয়ে ক্রিকেট খেলার খবর দেখছে, উপরে বড় বড় করে তারিখ লেখা সেটা দেখেও কারো জন্মদিনের কথা মনে পড়ল না।

শাঁওলী আবার ছোট একটা ধমক দিল, "তাড়াতাড়ি যা-দেরি হয়ে যাবে।"

বন্যা বই খাতা হোমওয়ার্ক পানির বোতল নিয়ে রওনা দিল— তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে বাসায় এতজন মানুষ কারো তার জন্মদিনের কথা মনে নেই। বন্যা একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিজের মনে বলল, "ঠিক আছে! আমি নিজেই আমি নিজের জন্মদিন করব। সারাদিন আমি নিজে নিজে আনন্দ করব।"

কোন একটা বিচিত্র কারণে আজকে বন্যার আনন্দ হল সবচেয়ে কম— তার যারা প্রাণের বন্ধু তারাও আজকে কেমন জানি এড়িয়ে গেল। বন্যা একবার বলারও চেষ্টা করল, "জানিস আজকে আমার—"

কথাটা শেষ করার আগেই মাঝখানে একজন সম্পূর্ণ অপ্রসংগিক একটা কথা বলে ফেলল— সেই ফালতু কথা নিয়ে সবাই এমন হৈচৈ শুরু করে দিল যে বন্যার কথাটা চাপা পড়ে গেল। মনে হলো কারও সামান্য ভদ্রতাজ্ঞানও নেই যে একটু পরে জিজ্ঞেস করবে— "বন্যা তুই যেন কী বলতে চাইছিলি?"

আজকের দিনটিতে বন্যা যে কোন আনন্দই করতে পারবে না বরং দিনটি যে ভয়ংকর একটা দিনে পাল্টে যাবে সেটা বন্যা টের পেলো শেষ পিরিওডে। ঐ পিরিওডটা জালাল স্যারের ক্লাস, জালাল স্যার ওদের ইংরেজি ক্লাস নেন। জালাল স্যারের কারণে এই ক্লাসের

কোন ছেলেমেয়ের ইংরেজি ভাষার জন্যে কোন ভালবাসা নেই। জালাল স্যারকে কেউ কখনো হাসতে দেখেনি— ক্লাসের সবার ধারণা কোন কারণে জালাল স্যার যদি কখনো হেসে ফেলেন সেই দৃশ্যটি হবে এত ভয়ংকর যে সেটি দেখেই মানুষের হার্টফেল করে মরে যাবে। জালাল স্যারের বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের ভেতরে মাথায় কাঁচা-পাকা চুল চোখগুলো স্থির। সেই চোখের দৃষ্টি দিয়ে যখন স্যার কারো দিকে তাকান তখন ভেতরে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়।

আজকে বন্যার জন্মদিনে শেষ পিরিওডে জালাল স্যার তার সেই বিখ্যাত স্থির দৃষ্টি দিয়ে বন্যার দিকে তাকালেন— কারণ দেখা গেল বন্যা তার হোমওয়ার্কটি আনেনি। স্যার ক্লাসে শেক্সপিয়ার পড়াচ্ছিলেন এবং জুলিয়াস সিজারের চরিত্র লিখে আনতে বলেছিলেন।

জালাল স্যার তার চোখের দৃষ্টি দিয়ে বন্যাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হোমওয়ার্ক কেন আননি?"

বন্যার ইচ্ছে হল ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে— কিন্তু সে কাঁদল না, অনেক কষ্ট করে চোখের পানি আটকে রাখল। বলল, "স্যার এনেছিলাম।"

"এনে থাকলে কোথায় গেল?"

"আমি জানি না স্যার। আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি হোমওয়ার্কটা ব্যাগে রেখেছিলাম।"

"তোমার ব্যাগ থেকে হোমওয়ার্কটা কী উড়ে বের হয়ে গেছে?"

অন্য কোন স্যার কিংবা আপার ক্লাস হলে এই কথাকে একটা কৌতুক হিসেবে বিবেচনা করে হাসা হতো। কিন্তু জালাল স্যারের ক্লাসে কেউ কখনো কোন কিছু নিয়ে হাসার চেষ্টা করেনি।

বন্যা মাথা নিচু করে চোখের পানি আটকে রাখার চেষ্টা করতে করতে বলল, "আমি জানি না।"

জালাল স্যার পাথরের মত মুখে কঠোর গলায় বললেন, "তুমি শুধু যে হোমওয়ার্ক আননি তাই নয়- সেটা নিয়ে আরো একটা মিথ্যা কৈফিয়ত দাঁড় করেছ।"

বন্যা কিছু বলল না। জালাল স্যার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ক্লাস শেষে তুমি তোমার হোমওয়ার্ক লিখে দিয়ে যাবে।"

আজকের ক্লাসের আবহাওয়া অন্যদিনের থেকে অনেক বেশি থমথমে হয়ে রইল। স্যার ক্লাসে রোমান রাজত্বে জুলিয়াস সিজারের চরিত্র বিশ্লেষণ করলেন, ব্রুটাসের দেশপ্রেম নিয়ে কথা বললেন কিন্তু তেরো বছরের একটা মেয়ের ভেতরকার অপমান এবং কষ্টটুকুর কিছুই বুঝতে পারলেন না।

ক্লাস শেষে বন্যা এবং আরো কয়েকটি মেয়ে একসাথে বাসায় ফিরে যায়, আজকে আর সেটি সম্ভব নয়। তারা বন্যার দিকে সমবেদনায় একটা দৃষ্টি দিয়ে চলে গেল। বাইরে হৈচৈ করে অন্যেরাও বাসায় চলে যাচ্ছে তার মাঝে বন্যা একা একা বসে তার হোমওয়ার্কটা আবার লিখতে বসল। ক্লাসের সব ছেলেমেয়েরা বাসায় যেতে যেতে উঁকি মেরে দেখে গেল বন্যা একা একা ক্লাসে বসে আছে। কী লজ্জা-কী লজ্জা!

কিছুক্ষণ পর ক্লাসরুম বন্ধ করতে এসে দারওয়ান অবাক হয়ে বলল, "কী হল আপা? আপনি বাসায় যাননি?"

বন্যা অনেক কষ্ট করে মুখে একটা শান্তভাব ধরে রেখে বলল, "হোমওয়ার্ক আনতে ভুলে গেছি- -সেটা লিখছি।"

দারওয়ান চুক চুক শব্দ করে বলল, "একদিন হোমওয়ার্ক না দিলে কী হয়? জালাল স্যার বেশি কড়া মানুষ!" দারওয়ান ভাইয়ের গলায় একটু সমবেদনার ছোঁয়া পেয়ে বন্যার চোখে পানি এসে গেল।

হোমওয়ার্কটি যখন প্রায় শেষ করে এনেছে তখন দরজায় ছায়া পড়ল, বন্যা তাকিয়ে দেখল জালাল স্যার, এসে দাঁড়িয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কতটুকু হয়েছে?"

"প্রায় শেষ।"

"দেখি।"

বন্যা স্যারের হাতে কাগজটি ধরিয়ে দিল। স্যার কাগজটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, "ঠিক আছে বাসায় যাও। আর কখনো যেন ভুল না হয়।"

বন্যা ব্যাগটাতে বইপত্র ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, "বাসা কোথায়?"

বন্যা বাসার ঠিকানা বলল। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, "কীভাবে যাবে?"

"রিকশা নিয়ে চলে যাব।"

স্যার এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন তারপর বললেন "আমিও ওদিকে যাচ্ছি, আস তোমাকে নামিয়ে দেব।"

বন্যা বলতে চাইল তার প্রয়োজন নেই কিন্তু বলার সাহস হল না।

রিকশায় পুরো রাস্তা স্যার চুপ করে বসে রইলেন একটা কথাও বললেন না। বন্যা যে একটা জলজ্যান্ত মানুষ সেটাও যেন তার চোখে পড়ল না। সে যেন মানুষ নয় সে যেন একটা চেয়ার, টেবিল কিংবা চাউলের বস্তা। বাসার সামনে এসে রিকশা থামিয়ে বললেন, "যাও।"

যতক্ষণ পর্যন্ত বন্যা তার বাসার দরজার সামনে পর্যন্ত না পৌঁছাল স্যার রিকশা থামিয়ে রাখলেন বন্যা বেল বাজানোর পর রিকশা ছেড়ে দিলেন।

বন্যা দ্বিতীয়বার বেল বাজালো বেশ অসহিষ্ণুভাবে সব মিলিয়ে মেজাজটা অসম্ভব খারাপ হয়ে আছে— বাসায় ঢুকে বই খাতা সবকিছু ছুড়ে ফেলে হাউমাউ করে কাঁদতে হবে। তৃতীয়বার বেল টেপার আগেই শাঁওলী দরজা খুলে দিল, উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "কী হল বন্যা এত দেরি কেন?"

বন্যা কোন কথা না বলে ঘরের ভিতরে ঢুকে যায় এবং ঠিক তখন পৃথিবীর সবচেয়ে অত্যাশ্চার্য ব্যাপার ঘটে গেল। পর্দার আড়ালে, খাটের নিচে, টেবিলের পিছনে দরজার আড়ালে, ফ্রিজের পিছনে লুকিয়ে থাকা তার ক্লাসের প্রায় সব ছেলেমেয়ে, সাগর সুমন আর ঝুমুর এমন কী তার আব্বু পর্যন্ত চিৎকার করে বের হয়ে এল। বন্যা প্রথমে হতচকিত হয়ে যায় এবং হঠাৎ করে বুঝতে পারে সবার মুখে একটা বাঁশি, হাতে এক ধরনের ফ্ল্যাগ, বাঁশি বাজাতে বাজাতে চিৎকার করে ফ্ল্যাগ নাড়তে নাড়তে সবাই তার দিকে ছুটে আসছে। বাঁশির শব্দে হাততালির শব্দে কানে তালা লেগে যাচ্ছে, চিৎকার করে সবাই কী বলছে শোনা যাচ্ছে না— কিন্তু বন্যার অনুমান করতে কষ্ট হয় না। সারা ঘরটি বেলুন দিয়ে, রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো হয়েছে দেওয়ালে বড় বড় করে লেখা "শুভ জন্মদিন বন্যা", টেবিলে কেক, মেঝেতে সাজিয়ে রাখা উপহার।

বন্যা হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবং সবাই এসে তাকে এক সাথে জাপটে ধরল। বন্যা বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে বলল, "তো-তো-তোরা- মানে তোমরা জা-জা-জানতে?"

বন্যার বান্ধবী ফারজানা বলল, "জানব না কেন? এক সপ্তাহ থেকে প্রিপ্যারেশন নিচ্ছি!"

"এক সপ্তাহ?"

"হ্যাঁ। সবচেয়ে কঠিন হয়েছিল কী জানিস?"

"কী?"

"জালাল স্যারকে ম্যানেজ করা।"

বন্যা মুখ হা করে তাকিয়ে রইল, একবার ঢোক গিলে বলল, "জালাল স্যার জানেন?"

"একশ বার জানেন! তা না হলে তোর হোমওয়ার্ক কোথায় গেল? তোকে ডিটেনশানে কেন রাখা হল?"

"তার মানে সবকিছু প্ল্যান করা?"

"হ্যাঁ।" ফারজানা এক গাল হেসে বলল, "এই নে তোর অরিজিনাল হোমওয়ার্ক। আমি তোর ব্যাগ থেকে চুরি করেছিলাম।"

বন্যার তখনও বিশ্বাস হয় না, রাগের ভঙ্গি করে ফারজানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, ফারজানা বলল, "খবরদার—আমার গায়ে হাত দিবি না। আমাকে যে অর্ডার দেয়া হয়েছে সেটা করেছি!"

শাঁওলী এসে বন্যার মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, "কেন তোরা খামোখা তোদের জালাল স্যার সম্পর্কে এরকম আজেবাজে কথা বলিস? আমি গিয়ে যখন বললাম এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন?"

বন্যা চোখে কপালে তুলে বলল, "কী বলেছ— তুমি জালাল স্যারকে।"

"বলেছি আমাদের আম্মু খুব হৈচৈ করে আমাদের জন্মদিন করতো এটা হবে আম্মু ছাড়া আমাদের প্রথম জন্মদিন। বন্যা নিশ্চয়ই খুব মন খারাপ করবে তাই তার মন ভাল করার জন্যে একটা ফাটাফাটি জন্মদিন করতে হবে— তার জন্যে বন্যাকে ক্লাসের শেষে আধঘণ্টা আটকে রাখতে হবে যেন সবাইকে নিয়ে আমরা রেডি হতে পারি।"

বন্যা চোখ কপালে তুলে বলল, "সেটা শুনে স্যার কী বললেন?"

"হা হা করে হেসে বললেন, ঠিক আছে!"

"হাসলেন?" ক্লাসের অন্য মেয়েরাও এবারে চিৎকার করে বলল, স্যার হাসলেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমরা কখনো স্যারকে হাসতে দেখিনি।"

শাঁওলী হাত নেড়ে বলল, "বাজে কথা বলিস না— সুইট একটা মানুষকে নিয়ে কী সব আজেবাজে কথা! যা হাতমুখ ধুয়ে কেক কাটতে আয়।"

ঝুমুর তখনো বন্যার হাত ধরে চিৎকার করে যাচ্ছে "হ্যাপি বার্থ-ডে! হ্যাপি বার্থ ডে!! হ্যাপি বার্থ-ডে!!!"

ঝুমুরকে একরকম চ্যাংদোলা করে বন্যা নিয়ে গেল হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলাতে।

বন্যার জন্মদিনের জন্যে নতুন ড্রেস কেনা হয়েছে তাকে সেটা পরে আসতে হলো। কেকের ওপর তেরোটা মোমবাতি ফুঁ দিয়ে সবগুলো নেভাতে হবে। বন্যা ফুঁ দিয়ে

মোমবাতি নেভাতে চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই নেভাতে পারে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার মোমবাতিগুলো নিভিয়ে দেওয়ার পরও আবার নিজে থেকে ফট করে জ্বলে ওঠে!

শওকত বলল, "পারবি না— কিছুতেই পারবি না! এগুলো স্পেশাল মোমবাতি- আমেরিকা থেকে আনিয়েছি!"

কাজেই মোমবাতিগুলো পানিতে ভিজিয়ে নেভাতে হলো। এবারে কেক কাটা— শাঁওলী ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত, সবাই গলা ছেড়ে হ্যাপি বার্থ-ডে গান গাইছে বন্যার চাকু যেই কেকটা স্পর্শ করলো ওমনি পুরো কেকটা প্রচণ্ড শব্দ করে ফেটে গেল, কেকের উপরে ফ্রস্টিং উড়ে সবাই মাখামাখি হয়ে গেল মুহূর্তে!

ব্যাপারটি যে একটা কৌতুক সেটা বুঝতে এক মুহূর্ত সময় লাগলো— সেটা বোঝার পর সবাই হাসতে হাসতে আবার গড়াগড়ি খেতে থাকে। সুমন বুকে থাবা দিয়ে বলল— "আমি বানিয়েছি। আমি বানিয়েছি এই কেক!"

বন্যা মুখ থেকে ফ্রস্টিং মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে বানালি?"

"বেলুন দিয়ে। ভিতরে বেলুন-উপরে শেভিং ক্রিম!"

হাসতে হাসতে শাঁওলীর চোখে পানি এসে গেল, চোখ মুছে বলল, "বলেছিলাম না ফাটাফাটি জন্মদিন হবে? হলো কিনা ফাটাফাটি— কেকটা ফাটলো কি না?"

বন্যাকে স্বীকার করতেই হল, জন্মদিনের শুরুটা ফাটাফাটি হয়েছে তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই!

এবারে সত্যিকার কেকটা আনা হলো কাটার জন্যে বন্যা ভয়ে ভয়ে কাটল সেই কেক, এবারে কিছুই আর ফেটে গেল না।

শাঁওলী সারাদিন খেটেখুটে রান্না করেছে, ছোট খাট রান্না চালিয়ে দিতে পারে কিন্তু বেশি মানুষের জন্যে রান্না এই প্রথম। স্কুল থেকে এসেছে বলে সবাই ক্ষুধার্ত রান্না ভাল না হলেও খুব সমস্যা ছিল না— একেকজন গোগ্রাসে খেতে শুরু করে।

খাওয়ার পর উপহার খোলা। বন্যাকে ঘরে সবাই মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে যায়। সুন্দর করে প্যাকেট করা হয়েছে— বন্যাকে একটা একটা করে খুলতে হল। সবচেয়ে মজা হল শওকতের প্যাকেট নিয়ে, বিশাল বাক্স, ভিতরে কী থাকতে পারে আন্দাজ করে কেউ বলল স্যুটকেস কেউ বলল লেপ! খোলা হলে দেখা গেল ভেতরে আরেকটা বাক্স। এর ভেতরে কী থাকতে পারে সেটা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল— কেউ বলল কম্বল কেউ বলল টেবিল ল্যাম্প। বাক্স খুলে দেখা গেল এর ভেতরে আরেকটা বাক্স। এবারে আর কেউ জল্পনা-কল্পনায় গেল না— আন্দাজ করে নিল নিশ্চয়ই তার ভেতরে আরেকটা বাক্স থাকবে। খুলে দেখা গেল সত্যিই তাই। এভাবে বাক্সের ভিতরে আরেকটি ছোট বাক্স হতে হতে সেটা এতো ছোট হলো যে শেষ পর্যন্ত তার ভিতরে একটা সেফটিপিন আঁটে কী না সন্দেহ। বন্যা শওকতের দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, "আব্বু এর ভিতরে যদি কিছু না থাকে ভাল হবে না কিন্তু!"

খুলে দেখা গেল সত্যি কিছু নেই— শুধু এক টুকরা কাগজ সেখানে লেখা, "বুক ভরা ভালবাসা!"

বন্যা চিৎকার করে উঠল, "আব্বু আমি তোমাকে খুন করে ফেলব।"

শওকত তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে একটা ছোট খাম বের করে বন্যার দিকে এগিয়ে দেয়। ভেতরে একটা হাতঘড়ি, অত্যন্ত মজার এবং আধুনিক কোনটা ঘণ্টারই কাটা কোনটা মিনিটের কাটা কিছু বোঝার উপায় নেই— কিন্তু দেখতে যা সুন্দর সেটি আর বলার মতো নয়! বন্যার সাথে সাথে তার সব বান্ধবীরা আনন্দধ্বনী করে উঠল।

শাঁওলীর প্যাকেট খুলেও মজা হল ভিতরে এক পাটি জুতো। বন্যা চোখ কপালে তুলে বলল, "আরেক পাটি কোথায়?"

শাঁওলী বলল, "সামনের বছর পাবি! এই বছর পয়সা ফুরিয়ে গেছে।"

ঝুমুর অবশ্যি এটা মেনে নিল না— সোফার তলায় লুকিয়ে রাখা আরেক পাটি জুতো খুঁজে বের করে ফেলল। তার উত্তেজনা সবচেয়ে বেশি কারণ জন্মদিনটা বন্যার হলেও প্রায় প্রত্যকটা উপহারের বাক্সের সাথে সাথে ঝুমুরের জন্যে একটা করে উপহার প্যাকেট করা হয়েছে— আনন্দে সে কী করবে বুঝতে পারছিল না।

বন্যার জন্মদিনের অনুষ্ঠান বিকেল বেলা শেষ হয়ে যাবার কথা থাকলেও সেটা রাত পর্যন্ত চলতে থাকল। সবাই মিলে আবার খিচুড়ি রান্নার পরিকল্পনা করছিল কিন্তু শওকত সবাইকে বাঁচিয়ে দিয়ে একটা ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে হ্যাম বার্গার কিনে আনল!

পার্টি যখন শেষ হল তখন গভীর রাত। শাঁওলী শুতে যাবার সময় বাইরের ঘরে বড় করে বাঁধিয়ে রাখা শান্তার ছবির সামনে থমকে দাঁড়াল, তার হঠাৎ মনে হল আম্মু বুঝি সত্যি সত্যি তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

রাত্রে খাবার টেবিলে শওকত বলল, "শাঁওলী, তুই একটা কাজ করতে পরবি?"

"সেটা নির্ভর করে কাজটা কী তার ওপর।"

"তোর ছোট চাচি ফোন করেছিল। পিপলুর জন্মদিন।"

শুনে ঝুমুর আনন্দে হাততালি দিল কিন্তু অন্য সবাই তাদের পাঁজরে কেউ ঘুষি মেরেছে সেরকম একটা যন্ত্রণার মতো শব্দ করল। শওকত বলল, "কী হল, তোরা সবাই এরকম হয়ে গেলি কেন? কোথাও যেতে চাস না, কিছু করতে চাস না?"

সাগর বলল, "আব্বু তুমি মনে হয় পিপলুকে দেখনি, তাই এই কথা বলছ।"

"দেখব না কেন, একশ বার দেখেছি।"

"তোমাকে দেখলে মনে হয় দৌড়ে এসে লাফ দিয়ে তোমার ঘাড় থেকে ঝুলে পড়ে না?"

"না।" শওকতকে স্বীকার করতে হল, "আমাকে মনে হয় একটু ভয় পায়।"

"আমাদেরকে ভয় পায় না। গতবার আমাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিল।"

শওকত বলল, "কী বলছিস, এইটুকুন ছেলে।"

বন্যা বলল, "এইটুকুন ছেলে হলেও একেবারে সলিড জিনিস। খাটি বিষ পিপড়া।"

শওকত বলল, "ছোট থাকতে সবাই একটু দুষ্টু হয়। তোরাও কম দুষ্টু ছিলি নাকি?"

শাঁওলী বলল, "আব্বু তুমি আমাকে একটা কাজ করতে বলছিলে।"

"হ্যাঁ। পিপলুর জন্যে একটা কিছু উপহার কিনে আনতে পারবি? আজকালকার ছোট বাচ্চারা কী পছন্দ করে জানিও না ছাই!"

"আমিও জানি না।" শাঁওলী সুমন এবং ঝুমুরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোরা কী পছন্দ করিস?"

সাগর বলল, "ওদেরকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। পিপলুর জন্যে যদি কোন উপহার কিনতে চাও তাহলে একটা চাইনিজ কুড়াল না হয় চাপাতি কিনে দাও।"

সবাই হি হি করে হাসতে লাগল, বন্যা বলল, "ঠিক বলেছ! এক্কেবারে ঠিক!"

শাঁওলী বলল, "ঠিক আছে আব্বু আমি তোমাকে একটা গিফট কিনে দেব— কিন্তু এক শর্তে।"

"কী শর্ত।"

"আমাকে তুমি ঐ পার্টিতে যেতে বলবে না। তুমি সবাইকে নিয়ে যাবে।"

সাগর বলল, "আমিও যাব না আব্বু।"

বন্যা বলল, "আমিও যাব না—"

সুমনও একই কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু শওকত একটা কড়া ধমক লাগাল, "ফাজলেমি রাখ। একটা জন্মদিনের পার্টিতে যাওয়া নিয়েও এত কী ধানাই পানাই শুরু করেছিস?" এক সন্ধ্যার ব্যাপার।"

শাঁওলী বলল, "আসলে ব্যাপারটা অন্য জায়গায়।"

"কোন জায়গায়?"

"ছোট চাচির একজন বোন আছেন, ডিভোর্স হয়ে গেছে এখন অন্য জায়গায় বিয়ে হয়েছে।"

"হ্যাঁ। তার কী হয়েছে?"

"তার একটা ছেলে আছে, নাম জাহিদ, আমার থেকে বছর দুই বড়। আগে তার বাবার সাথে থাকত। এখন বাবাও বের করে দিয়েছে।"

"তাই নাকি? তুই দেখি অনেক খবর রাখিস।"

"হ্যাঁ আব্বু আমি অনেক খবর রাখি। জাহিদ এখন ছোট চাচির বাসায় থাকে। সে হচ্ছে মহাযন্ত্রণা। ঐ বাসায় সব সময়েই একটা না একটা ঝামেলা করছে। আমার ধারণা ঐ জাহিদ কোন একদিন একটা খুন খারাপি করে ফেলবে।"

"কী বলছিস তুই!"

"আমি ঠিকই বলছি। জন্মদিনে গিয়ে তুমি একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখো। এই জন্যে আমি ঐ বাসায় যেতে চাই না। একেবারে বাজি ধরে বলতে পারি যখন পার্টি চলতে থাকবে তখন এই ছেলে এসে মহা–হাঙ্গামা শুরু করবে।"

ছোট চাচির বড় বোনের ছেলে জাহিদের এই তথ্যগুলো অন্য কেউ জানত না, এবারে সবাই উৎসাহী হয়ে উঠল। সাগর জিজ্ঞেস করল, "জাহিদ ভাই কী রকম হাঙ্গামা করবে আপু?"

বন্যা জানতে চাইল, "গুলিটুলি করবে নাকি?"

শাঁওলী বলল, "যা একটা চিড়িয়া, করলেও আমি এতটুকু অবাক হবো না। চেঁচামেচি করে থালা–বাসন ভেঙে যে একটা কেলেংকারি করবে সে ব্যাপারে আমার একটুও সন্দেহ নেই।"

সাগর হাতে কিল দিয়ে বলল, "তাহলে তো পার্টিতে যেতেই হয়!"

সুমনও মাথা নাড়ল, "আমিও যাব!"

বন্যা ফিক করে হেসে বলল, "এই রকম দুর্ধর্ষ ফাইটিং বাংলা সিনেমা না দেখলে কেমন করে হয়?"

সাগর শাঁওলীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা সবাই মিলে মজা দেখার জন্যে যাচ্ছি পরে যদি কোন ফাইটিং না হয় তোমার কপালে কিন্তু দুঃখ আছে আপু।"

"কী দুঃখ? টিকেটের পয়সা ফেরৎ নিবি?"

সবাই হি হি করে হাসতে থাকে শুধু শওকত গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলল, "এটা কোন হাসির ব্যাপার না।"

শওকত তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখল প্রায় সবাই এসে গেছে। শওকত তার বয়সী কয়েকজনকে নিয়ে বাইরের ঘরের এক কোনায় রাজনীতির আলাপে মজে গেল। শাঁওলী তার ছোট চাচিকে খাবার দাবার নিয়ে সাহায্য করতে শুরু করল। বন্যা তার থেকে বয়সে ছোট সবাইকে নিয়ে একটা খেলা আবিষ্কার করে ফেলল, পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে লাফানোর সেই খেলা এত উত্তেজনার সৃষ্টি করল যে পিপলু পর্যন্ত তার দুষ্টুমি থামিয়ে তাদের সাথে খেলতে শুরু করে দিল। সাগরের এমন একটা বয়স যে সে এখন খুব ঘনিষ্ঠ কেউ না হলে তার সাথে মিশতে পারে না, তাই সে মোটামুটি একা এবং দলছুটভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সত্যি কথা বলতে কী ছোট চাচির বোনের সেই খ্যাপা ছেলের কথা কারও মনেই থাকল না।

জন্মদিনের কেক কাটার পর যারা দূরে যাবে তারা যখন প্রথম ব্যাচে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে ঠিক তখন অতিথিদের হৈচৈ ছাপিয়ে প্রথমবার একটা ধমকের শব্দ শোনা গেল, কোন একজন মহিলা চাপা স্বরে বললেন, "খবরদার তুই আমার সাথে এভাবে কথা বলবি না।"

কে কার সাথে কীভাবে কথা বলছে দেখার জন্যে অনেকেই মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, এবং দেখতে পেল ছোট চাচির বোন হাতে খাবারের প্লেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তার সামনে উনিশ কুড়ি বছরের একটা ছেলে কোমরে হাত দিয়ে মারমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটি মোটামুটি সুদর্শন, সার্টের অনেকগুলো বোতাম খোলা বলে চেহারার মাঝে এক ধরনের উদ্ধত ভাব খুব স্পষ্ট। ভদ্রমহিলা আড়চোখে এদিক সেদিক তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, "জাহিদ, তোকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, তুই আমার সাথে এভাবে কথা বলবি না।"

ছেলেটি দুই হাত উপরে তুলে পুরো পৃথিবী ওলটপালট করার ভঙ্গি করে বলল, "কেন? তোমার সাথে এভাবে কথা বলতে আমার অসুবিধে কী? তুমি কে? জন্ম দিয়েছ বলেই তুমি আমার মা হয়ে গেছ?"

জাহিদের মা অপমানে লাল হয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু তার গলা ছাপিয়ে জাহিদ চিৎকার করে বলল, "আমাকে লাথি মেরে বাসা থেকে বের করে দিয়ে তুমি প্রথম চান্সে বিয়ে করে ফেললে তোমার লজ্জা করল না?"

এরকম সময়ে ছোট চাচি এসে জাহিদের হাত ধরে টেনে বললেন, "তুমি এসব কী বলছ জাহিদ? ছিঃ!"

"আমি ঠিকই বলছি। আমার নিজের মা আছে বাবা আছে কিন্তু আমার থাকতে হয় খালার বাসায়। আমার লজ্জা করে না?"

জাহিদের মা দুর্বল গলায় বললেন, "তোকে কী আমরা থাকতে না করেছি? তুই থাকতে চাস না—"।

শুনে জাহিদ হঠাৎ একেবারে বাঘের মত হুংকার দিয়ে বলল, "খবরদার তুমি আজেবাজে কথা বলবে না। এই যে তোমার হাজব্যান্ড দাঁড়িয়ে আছে তাকে জিজ্ঞেস করো সে আমার সাথে কী ব্যবহার করেছে!"

জাহিদের মায়ের কাছাকাছি শুকনো মতোন চালবাজ ধরনের একজন মানুষ দাঁড়িয়েছিল জাহিদ তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস কর, "এক্ষুণি জিজ্ঞেস করো সবার সামনে। ফয়সালা হয়ে থাক।"

চালবাজ ধরনের মানুষটির মুখ কেমন জানি ফ্যাকাসে হয়ে গেল, ঢোক গিলে বলল, "আ-আমি কী করেছি?"

জন্মদিনের পুরো পরিবেশটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, ছোটরা চোখ বড় বড় করে দেখছে, বড়রা হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জাহিদের চোখ, কান, নাক দিয়ে বাঘের মত নিঃশ্বাস নিতে নিতে হাত ছুড়ে বলল, "আমার কী ফ্রাস্টেশন হয় না? রাগ হয় না? সারা দুনিয়ায় আমার একটা নিজের মানুষ নেই।"

জাহিদের মায়ের বুদ্ধি নিশ্চয়ই খুব বেশি নয়— কারণ তিনি তখন অনেকটা খোঁচা দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "তুই তোর বাবার কাছে যাস না কেন?"

"বাবার কাছে যাই না কেন?" জাহিদ হুংকার দিয়ে বলল, "যেই বাবা বলেছে আমি গেলে আমাকে পুলিশের কাছে দেবে সেই বাবার কাছে যাব আমি?"

জাহিদের ধারে কাছে যাবার কারো সাহস নেই, সবাই এক ধরনের আতংক নিয়ে তাকিয়ে আছে, সবাই ভাবছে এখন না সে কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলে। এবং হলোও তাই, রাগে চিৎকার করে সে বলল, "আমি সবাইকে খুন করে ফেলব—" এবং কথা বলার সময় এত জোরে হাত নাড়ল যে হাতে লেগে পাশে রাখা শোকেসের উপর থেকে একটা ফুলদানি উড়ে গিয়ে নিচে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। জাহিদ ভ্রুক্ষেপ করল না, ছুটে গিয়ে টেবিল থেকে কয়েকটা থালাবাটি তুলে চিৎকার করে দেয়ালে ছুড়ে মারল, তারপর খপ করে পিপলুর কেক কাটার চাকুটা হাতে তুলে নিল, তখন তাকে দেখাতে লাগল ভয়ংকর। মনে হল এখন সে বুঝি সত্যিই কাউকে খুন করে ফেলবে— চারপাশে ঘিরে থাকা বাচ্চাদের কয়েকজন "ই-ই-ই" করে এক ধরনের চিৎকার করল। জাহিদ নাক দিয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "খুন করে ফেলব। আমি সবগুলোকে খুন করে ফেলব।"

কেউ কোন কথা বলল না, জাহিদের মায়ের চালবাজ ধরনের স্বামী ফ্যাকাসে মুখে তার স্ত্রীর পিছনে লুকানোর চেষ্টা করতে থাকে। জাহিদ চিৎকার করে কিছু একটা কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ করে ভেঙে পড়ে বলল, "তোমরা কেউ ভেবে দেখেছ যে মানুষটাকে সারা দুনিয়ার কেউ দেখতে পারে না তার কেমন লাগে? যার সারা দুনিয়ায় কোন যাবার জায়গা নেই তার কেমন লাগে?"

ছোট চাচি বললেন, "আমার বাসায় তোর জায়গা আছে।"

"নেই। তুমি আমাকে দয়া করে রাখ। আমি জানি তোমার বাসাতেও আমার জায়গা নেই। থাকার কথা না। তুমি বল আমি কোথায় যাব?"

ঠিক তখন শোনা গেল ঝুমুর রিনরিনে গলায় বলছে, "তুমি আমাদের বাসায় আস। আমাদের বাসায় অনেক জায়গা।"

ভয়ংকর উত্তেজনার মাঝে হঠাৎ করে ঝুমুরের এই সহজ সমাধানটি পুরো পরিবেশটাকে তরল করে দিল। ছোট বাচ্চারা হি হি করে হেসে উঠে, বড়রাও হাসি আটকে রাখতে পারে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার চাকু হাতে দাঁড়িয়ে থাকা জাহিদও হঠাৎ করে হেসে উঠল, তার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা পানি বের হয়ে এসেছে, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে হাসি এবং কান্নার মাঝামাঝি একটা জিনিস করে বলল, "দেখেছো? সারা দুনিয়ার মাঝে এই প্রথম আমার সাথে একজন মানুষ ভাল করে কথা বলেছে! এই প্রথম!" জাহিদ ঝুমুরকে দেখিয়ে বলল, "দুই বছরের একটা বাচ্চা আমার কষ্টটা বুঝে কিন্তু কোন বড় মানুষ বুঝে না।"

ঝুমুর প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল, "আমার বয়স চার বছর। দুই বছর না।"

আবার অনেকে হেসে উঠল, তখন ঝুমুর ব্যস্ত হয়ে শাঁওলীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপু আমার চার বছর বয়স না?"

শাঁওলী মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।" তারপর হঠাৎ করে কোন কিছু না ভেবেই জাহিদের দিকে তাকিয়ে বলল, "জাহিদ ভাই তোমার যদি সত্যিই মনে হয় তোমার কোন থাকার জায়গা নেই তাহলে তুমি আমাদের বাসায় থাকতে পার।"

জাহিদ হিংস্র মুখে বলল, "আমাকে দয়া করছ?"

"না। তুমি যেভাবে চাকু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেউ সখ করে তোমাকে দয়া করবে না।"

"তাহলে আমাকে দেখে তোমার ভয় লাগছে না?"

"না। তুমি যে চাকুটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ এটা কেক কাটার চাকু—এটা দিয়ে শুধু কেক কাটা যায় মানুষ কাটা যায় না।" শাঁওলী এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "চাকুটা দাও জাহিদ ভাই।"

জাহিদ অনেকটা বোকার মতো চাকুটা একনজর দেখল তারপর সেটা শাঁওলীর হাতে দিল, দিয়ে বেশ অবাক হয়ে একবার ঝুমুরের দিকে তাকাল তারপর আবার শাঁওলীর দিকে তাকাল, তারপর যেন বুঝতে পারছে না এভাবে ছটফট করে বলল, "এই বাচ্চাটার কথা না হয় বুঝতে পারলাম যে সে কিছু বুঝে না বলে আমাকে যেতে বলছে। তুমি কেন বলছ?"

"বলছি কারণ দুনিয়াটা তুমি যত খারাপ জায়গা মনে করো সেটা আসলে তত খারাপ না সেটা দেখানোর জন্যে। আর—"

"আর কী?"

"শুধু অন্যের দোষ দেখলে হয় না। নিজের দোষও দেখতে হয়। তুমি কী রকম মানুষ যে এরকম সুন্দর একটা পার্টির একেবারে বারটা বাজিয়ে দিলে? কত সখ করে বাচ্চা কাচ্চারা এসেছে। কতদিন থেকে সবাই মিলে এই জন্মদিনের প্রিপারেশন নিয়েছে—"

জাহিদকে এই প্রথমবার কেমন যেন হতচকিত দেখালো, তার মুখে লজ্জার একটা ছায়া পড়ল, সে মাথা ঘুরিয়ে চারিদিকে তাকাল এবং মনে হল প্রথমবার বুঝতে পারল যে তার চারদিকে ঘিরে মানুষ, সবাই তাকে দেখছে এবং এখানে একটা জন্মদিনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। সে ফ্যাকাসে মুখে বলল, "আই এ্যাম সরি। আমি-আমি মানে—" জাহিদ কথা শেষ না করেই হঠাৎ লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

জাহিদ চলে যাবার পর প্রথম কয়েক সেকেন্ড কেউ কোন কথা বলল না, প্রথম কথা বলল জাহিদের মায়ের স্বামী। কাঁধ ঝাঁকুনী দিয়ে চোখ ওল্টে বলল, "সর্বনাশ! কী ডেঞ্জারাস ইয়ং ম্যান। নো ওয়ান্ডার নিজের বাবা পুলিশে দিতে চায়।"

উপস্থিত কেউ কোন কথা বলল না। মানুষটা হঠাৎ তার মুখে তেলতেলে এক ধরনের হাসি ফুটিয়ে তার স্ত্রীকে বলল, "হানি! চলো আমরা যাই। তোমার উপর নিশ্চয়ই খুব ধকল গিয়েছে।"

জাহিদের মা হাতের প্লেটটা টেবিলে রেখে বলল, "হ্যাঁ। চল যাই।"

এই দুইজন চলে যাবার পর এবং মেঝে থেকে ভাঙা ফুলদানি এবং থালাবাসন পরিষ্কার করার পর আবার জন্মদিনের পার্টি শুরু হল, কিন্তু কোথায় জানি সুর কেটে গেছে আর কিছুতেই সেই সুর ফিরিয়ে আনা গেল না।

বাসায় আসার সময় শাঁওলী নরম গলায় শওকতকে জিজ্ঞেস করল, "আব্বু। তুমি কী রাগ করেছ?"

"কেন?"

"আমি যে জাহিদ ভাইকে আমাদের বাসায় এসে থাকতে বলেছি।"

শওকত নরম গলায় বলল, "না রে পাগলী আমি রাগ করিনি। সত্যি কথা বলতে কী—"

"কী?"

"তুই যেভাবে ছেলেটার সাথে কথা বলেছিস যে আমি খুব অবাক হয়েছি। বলতে পারিস মুগ্ধ হয়েছি।"

শাঁওলী ছোট বাচ্চার মতো খুশি হয়ে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ। তোর ভেতরে তোর আম্মুর কিছু একটা আছে। তোর আম্মু এরকম ছিল।"

"কী রকম?"

"মানুষের জন্যে এক ধরনের মায়া। এটা খুব সাংঘাতিক জিনিস। পৃথিবীটাকে এটা পাল্টে দেয়।"

সুমন জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী মনে হয় আব্বু। জাহিদ ভাই কী সত্যি চলে আসবে?"

শাঁওলী বলল, "আরে না! মানুষটার মান অপমান জ্ঞান খুব টনটনে— চেনে না শুনে না একজনের বাসায় হুট করে চলে আসবে না। কখনোই আসবে না!"

দুদিন পর বিকেলের দিকে বাসার বেল বেজেছে—শাঁওলী দরজা খুলে দেখে জাহিদ দাঁড়িয়ে আছে। মাথার চুল এলোমেলো মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শাঁওলীকে দেখে দুর্বলভাবে একটু হেসে বলল, "ইয়ে- মানে- আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম ভাবলাম—"

শাঁওলী জাহিদকে দেখে ভিতরে ভিতরে ভয়ানক চমকে উঠলেও বাইরে সেটা প্রকাশ করল না। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "এসো জাহিদ ভাই।"

জাহিদ বলল, "নাহ্ আসব না। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম ভাবলাম একটু দেখা করে যাই।"

"এসো।"

জাহিদ আবার বলল, "নাহ্ আসব না। যাই।"

কিন্তু সে চলেও গেল না দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। শাঁওলী এবারে একটু জোর করে বলল, "এসো—এক কাপ চা খেয়ে যাও।"

তখন জাহিদ ভিতরে ঢুকল, হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হল সে কাচের উপর দিয়ে হাঁটছে জোরে হাঁটলে যেন কাচ ভেঙে নিচে পড়ে যাবে। সাবধানে হেঁটে এসে সে সোফায় বসল, বসার ভঙ্গিতে কোন আরামের চিহ্ন নেই— মেরুদণ্ড সোজা করে বসে থাকা।

শাঁওলী সামনে আরেকটা সোফায় বসে খুব সহজ গলায় বলল, "তারপর তোমার কী খবর?"

জাহিদ কোন কথা না বলে মাথা নাড়ল তার উত্তর যে কোন কিছু হতে পারে।

শাঁওলী আবার চেষ্টা করল, "চা খাবে জাহিদ ভাই?"

জাহিদ কাঁধ একটু নাচাল, এটারও উত্তর যা কিছু হতে পারে। শাঁওলী এবারে কি জিজ্ঞেস করবে ভাবছিল তখন ঝুমুর এসে পড়ায় রক্ষা, সে জাহিদ ভাইকে দেখে একটা আর্ত-চিৎকার দিয়ে বলল, "সর্বনাশ! তুমি আজকেও কী প্লেট ভাঙবে?"

জাহিদ এবারে হেসে ফেলে বলল, "না। ভাঙব না।"

ঝুমুর মাথা নেড়ে গম্ভীর মুখে বলল, "হ্যাঁ। আমাদের বাসায় কোন প্লেট ভেঙো না। তাহলে আমরা ভাত খেতে পারব না।"

শাঁওলী হাসি চেপে রেখে ঝুমুরের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলল, "ব্যাস অনেক হয়েছে উপদেশ দেওয়া। এখন তুমি যাও।"

ঝুমুর যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখাল না, শাঁওলীর পাশে বসে গম্ভীর মুখে জাহিদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ তিনজন চুপচাপ বসে রইল, অবস্থাটা যখন মোটামুটিভাবে একটা হাস্যকর অবস্থায় চলে এলো তখন শাঁওলী উঠে বলল, "তুমি বস জাহিদ ভাই, আমি তোমার জন্যে একটু পেপসি নিয়ে আসি।"

জাহিদ হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না, শাঁওলী তখন উঠে দাঁড়িয়ে ভিতরে গেল, এবং আবিষ্কার করল দরজার ও পাশে সুমন, বন্যা আর সাগর তিনজনেই কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। সাগর ফিস ফিস করে বলল, "জাহিদ ভাইয়া চলে এসেছে— এখন কী হবে?"

বন্যা বলল, "আবার যদি খেপে যায়?"

শাঁওলী ভ্রুকুটি করে নিচু গলায় বলল, "খেপে যাবে কেন?"

সুমন বলল, "মনে নেই সেদিন?"

শাঁওলী ফ্রিজ থেকে এক বোতল পেপসি বের করে গ্লাসে ঢেলে ফিসফিস করে বলল, "বাজে কথা বলিস না।"

শাঁওলীর পিছু পিছু তিনজন বাইরের ঘরের দরজার কাছাকাছি এসে থেমে গেল। শাঁওলী সহজ গলায় বলল, "সাগর ,বন্যা আর সুমন—আয় তোদের সাথে জাহিদ ভাইয়ের পরিচয় করিয়ে দিই।"

তিনজন প্রথমে মুখ বিকৃত করে নিঃশব্দে শাঁওলীর মুণ্ডুপাত করল তারপর আর কোন উপায় নেই বলে একটা সহজ ভঙ্গি করে ভিতরে ঢুকল। শাঁওলী বলল, "তোমার সাথে আগে

দেখা হয়েছে এখন হয়তো ভুলে গেছ। এই যে, এরা হচ্ছে সাগর, বন্যা আর সুমন। আর এই হচ্ছে জাহিদ ভাই।"

ঝুমুর পরিচয়টি আর খোলাসা করে বলল, "মনে নেই সেদিন জাহিদ ভাই প্লেট ছুড়ে ভেঙেছিল? তারপর একটা চাকু দিয়ে মার্ডার করেছিল?"

শাঁওলী অনেক কষ্টে হাসি চেপে রেখে বলল, "খুব হয়েছে ঝুমুর। তোমার আর দালালি করতে হবে না।"

সুমন ঝুমুরের মাথায় চাটি দিয়ে বলল, "তুই জানিস মার্ডার মানে কী?"

ঝুমুর চোখ পাকিয়ে বলল,"জানি।" "ঝুমুর সোফা থেকে নেমে একটা অদৃশ্য চাকু ভয়ংকর ভঙ্গিতে ধরে বলল। যখন চাকু এইভাবে ধরে সেইটাকে বলে মার্ডার।" দৃশ্যটি এত কৌতুককর যে সবাই হি হি করে হাসতে শুরু করে। জাহিদ হাসল সবচেয়ে জোরে এবং তখন সবাই আবিষ্কার করল জাহিদ নামক এই ভয়ংকর খ্যাপা মানুষটা যখন হাসে তখন তাকে দেখতে বেশ দেখায়, মনে হয় মানুষটা আসলে খারাপ না। শাঁওলী প্রায় না ভেবেই বলল, "জাহিদ ভাই তুমি আজকে আমাদের বাসায় ডিনার করে যাও।"

জাহিদ কিছু উত্তর দেবার আগেই বন্যা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "আপু!"

"কী হয়েছে?"

"তুমি আজকে কী দিয়ে ডিনার খাওয়াবে?"

"কেন? কী হয়েছে?"

"বাসায় খাবার কিছু নেই। আব্বু ফাঁকি মেরেছে, বাজার করে দেয়নি—"

শাঁওলী হাসি দিয়ে পুরো ব্যাপারটি উড়িয়ে দিয়ে বলল, "যা আছে তাই খাব। আমি কী হাতি-ঘোড়া ডিনার খাওয়াব?"

সাগর বলল, "হাতি-ঘোড়া দূরে থাকুক বাসায় ব্যাঙ— টিকটিকিও নেই।"

"যাই হোক সেটার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

জাহিদ এবারও কোন কথা বলল না, এরকম আলোচনার মাঝে সাধারণত বলতে হয় যে তার খাওয়ার জন্যে এরকম ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু ছেলেটি মনে হয় এসব জানে না। তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে বলল, "বেশি রাগ উঠে গিয়েছিল।"

সবাই নিজেদের মাঝে কথাবার্তা থামিয়ে জাহিদের দিকে তাকাল, সে আরো কিছু বলবে ভেবে একটু সময় অপেক্ষা করে কিন্তু জাহিদ কিছু বলল না। শাঁওলী জানতে চাইল, "পিপলুর জন্মদিনের ঘটনা বলছ?"

"না। আজকের ঘটনা।"

সবাই সোজা হয়ে বসে। আজকে আবার কী ঘটেছে? জাহিদ এবার নিজের থেকেই বলল, "রাগ উঠলে আমার মাথা ঠিক থাকে না।"

শাঁওলী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "আজকে কী করেছ?"

"মনে হয় মাথা ফেটে গেছে।"

"কার মাথা ফেটে গেছে?"

জাহিদ অন্যমনস্ক ভাবে বলল, "গায়ে যদি জোর না থাকে তাহলে আমার সাথে লাগতে আসে কেন?"

"কে লাগতে এসেছিল?"

"আমি এইভাবে একটা ধাক্কা দিয়েছি—" জাহিদ ধাক্কা দেয়ার ভঙ্গি করে দেখাল, "আর মানুষটা ফুটবলের মতো গড়িয়ে গেল।"

"কোন মানুষটা?"

"সিঁড়ি দিয়ে এইরকম করে গড়িয়ে গেল।" দৃশ্যটি কল্পনা করে এক ধরনের আনন্দে জাহিদের চোখ চকচক করে উঠে।

শাঁওলী এবারে অধৈর্য হয়ে গলা উচিয়ে বলল, "জাহিদ ভাই— তুমি কাকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে এসেছ?"

"আমার আব্বা।" জাহিদ মাথা নেড়ে বলল, "অসম্ভব পাজী মানুষ। ক্রিমিন্যাল।"

সবাই চোখ বিস্ফারিত করে জাহিদের দিকে তাকিয়ে রইল কেউ যে তার বাবার সম্পর্কে এরকম কথা বলতে পারে নিজের কানে না শুনলে সেটা বিশ্বাস করত না। শাঁওলী বলল, "কী জন্যে তুমি তোমার আব্বাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছ?"

"সে অনেক বড় ঘটনা। আসলে একেবারে খুন করে ফেলা উচিত ছিল।"

জাহিদের মুখ হঠাৎ পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়, শাঁওলী কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। সে গলার স্বর সহজ করে বলল, "থাকুকগে, যা হবার হয়েছে।"

"না তুমি শোন। ঐ বদমাইসটা কী করেছে- ঐ শুওরের—"

শাঁওলী এবার কঠিন গলায় বলল, "জাহিদ ভাই, এখন থাক। এখানে ছোটরা আছে— তুমি পরে বল। তুমি তো ডিনার খেয়ে যাবে— বলার অনেক সময় পাবে।"

জাহিদ মনে হল প্রথমবার আবিষ্কার করল যে তার চারপাশে ছোট বাচ্চারা আছে। সে থতমত খেয়ে থেমে গিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর সোফায় হেলান দিয়ে বসে উপরের দিকে তাকিয়ে রইল। শাঁওলী ঠিক কী করবে বুঝতে পারল না, খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ করে বলল, "জাহিদ ভাই, তুমি কী কোনদিন বাজার করেছ?"

জাহিদ অবাক হয়ে শাঁওলীর দিকে তাকিয়ে বলল, "কেন?"

"না, আমি জানতে চাইছিলাম।"

"করব না কেন? আমি বাজার করার মাঝে এক্সপার্ট। কোন শালা আমাকে ঠকাতে পারে না।"

শাঁওলী জাহিদের অশালীন কথাগুলো সহ্য করে বলল, "তাহলে তুমি আমাদের একটা কাজ করে দাও।"

"কী কাজ?"

"শুক্রবারের আব্বুর বাজার করে দেওয়ার কথা। এই শুক্রবারে আব্বু ফাঁকি মেরেছে— বাজার করে দেয়নি। তুমি আমাদের বাজার করে দাও।"

"কী বাজার করতে হবে?"

"বেশি কিছু না। তুমি যা খেতে চাও।"

"আমি যা খেতে চাই?" জাহিদ আবার ভাল মানুষের মতো হেসে ফেলল।

"হ্যাঁ। আর তুমি যেহেতু বাজার করায় এত বড় এক্সপার্ট তুমি সাথে সাগরকে নিয়ে যাও। কীভাবে বাজার করতে হয় সেটার উপরে একটা শর্ট কোর্স দিয়ে দিবে।"

বন্যা হি হি করে হেসে বলল, "ভাইয়া বাজার করবে? তাহলেই হয়েছে।"

সাগর বলল, "কেন? আমি বাজার করতে পারব না?"

"পারবে না কেন? একশ বার পারবে। তবে ব্যাপারটা কী হবে বুঝতে পারছ না?"

"কী হবে?"

"মনে কর মাছওয়ালা বলল একটা মাছের দাম একশ টাকা। ভাইয়া তখন বলবে— আহা বেচারা গরিব মানুষ দশ টাকা বেশি দিই ; সে বলবে, একশ দশ টাকায় দিবে প্লিজ?"

শাঁওলী মাথা নেড়ে বলল, "সেটা ঠিকই বলেছিস।"

সুমন বলল, "আর যদি পচা মাছ থাকে তখন কী করবে আপু?"

"পচা মাছ থাকলে বলবে, আহা বেচারার পচা মাছ কেউ কিনছে না। আমি কিনে নিই ; গরিব মানুষ।" শাঁওলী সাগরের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই না রে সাগর?"

সাগর উষ্ণ হয়ে বলল, "বাড়াবাড়ি করা তোমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে।"

বন্যা বলল, "কখন বাড়াবাড়ি করলাম? সেইদিন রিকশাওয়ালা ভাড়া চাইল আট টাকা তুমি তাকে দশ টাকা দিলে কী না?"

"দিলে দিয়েছি। তোর টাকা থেকে দিয়েছি?"

শাঁওলী থামিয়ে দিয়ে বলল, "আহ্! তোরা থাম। সাগর তোকে কেউ খারাপ বলছে না। বলছে তোর বুকে রয়েছে একটা কোমল হৃদয়। সেই কোমল হৃদয় সব দুঃখী মানুষকে সাহায্য করার জন্যে আকুল হয়ে আছে— শুধু পচা মাছটা আনবি না।"

জাহিদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "দাও বাজারের লিস্ট দাও।"

শাঁওলী ঝটপট কাগজে কয়েকটা জিনিসের নাম লিখে জাহিদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এই যে লিস্টি। তুমি একটু দাঁড়াও টাকা দিয়ে দিই।"

"টাকা লাগবে না। আমার কাছে আছে।"

শাঁওলী অবাক হয়ে বলল, "তোমার কাছে আছে মানে?

জাহিদ পকেটে থাবা দিয়ে বলল, "এই টাকা নিয়েই তো এত গোলমাল। আমরা বাপ ব্যাটা—"

শাঁওলী হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলল, "না জাহিদ ভাই, তোমার টাকা দিয়ে তুমি আমাদের জন্যে বাজার করে দেবে কেন? লোকজন শুনলে কী বলবে?"

"কী বলবে?"

"মানুষ ফুল, বই এইসব ভাল ভাল জিনিস উপহার দেয়— আর তুমি উপহার দিচ্ছ মাগুর মাছ আর ঢ্যাড়শ? ফাজলেমি নাকি?

বন্যা ভয়ে ভয়ে বলল, 'আপু তুমি কী সত্যিই মাগুর মাছ কিনতে দিচ্ছ?"

"না। এইটা একটা কথার কথা।"

জাহিদ আবার চেষ্টা করল, বলল, "কিন্তু—"

"কোন কিন্তু না। তুমি যদি বাজার খরচ দেওয়ার চেষ্টা করো তাহলে তোমাকে এই বাসায় ঢুকতে দেব না। ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি থেকে দিয়ে আমাকে বলের মত গড়িয়ে দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিলেও ঢুকতে দেব না।"

জাহিদ আবার হেসে ফেলল, এবং এবারেও তাকে একজন ভালো মানুষের মতো দেখালো।

সাগরকে নিয়ে জাহিদ বাজার করতে বের হয়ে যাবার পর বন্যা মাথা নেড়ে বললে, "তোমার সাহস আছে আপু।"

"কেন? সাহসের কী দেখলি?"

"এই যে জাহিদ ভাইয়ের মতো এত বড় মাস্তান মানুষটাকে বাজার করতে পাঠিয়ে দিলে।"

শাঁওলী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তুই বুঝতে পারছিস না! জাহিদ বেচারার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ যে তার কোন আপনজন নেই। ফ্যামিলি নেই। তাই তাকে নিজের মানুষের মতো দেখলেই দেখবি সমস্যা মিটে যাবে।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"কেমন করে জানি সেটা জানি না। কিন্তু আমি জানি। আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি।"

"সেটা ঠিক।" বন্যা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি অনেকটা আম্মুর মতো।"

সুমন বলল, "জিনেটিক প্রোফাইল এর রকম।"

বন্যা ভুরু কুঁচকে বলল, "কী বললি তুই?"

"বলেছি আপুর জিনেটিক প্রোফাইল আম্মুর মতো।"

"দেখ সুমন। সব জিনিসকে ঘোট পাকাবি না।"

"আমি কখন ঘোট পাকালাম?"

"সাধারণ একটা কথা বললেও তার মাঝে সায়েন্স নিয়ে আসবি না।"

"কখন সায়েন্স আনলাম? আমি কী ডমিনেন্ট এলেলের কথা বলেছি? নাকি রিসেসিভ এলেলের কথা বলেছি? আমি শুধু বলেছি—"

"থাক।" বন্যা হাসি চেপে বলল, "এই হচ্ছে সায়েন্টিস্টদের অবস্থা! জানে পর্যন্ত না যে কী বলছে! তোর বউয়ের যে কী দশা হবে।"

সুমন কঠিন মুখ করে বলল, "আমি কখনো বিয়ে করব না।"

"সেটা খারাপ না। তোর বিয়ে না করাই ভাল। তা না হলে তোর বউয়ের বারটা বেজে যাবে।"

ঝুমুর জানতে চাইল, "কেন ছোট পু? কেন বউয়ের বারটা বেঝে যাবে?

"কারণ যদি কোন দিন আকাশে চাঁদ ওঠে তখন সুমনের বউ খুব রোমান্টিক ভাবে বলবে, ওগো দেখো আকাশ কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে। এই সুন্দর চাঁদের আলোতে আমি একটা গান গেয়ে শুনাই? তখন সুমন বলবে, তুচ্ছ চাঁদ একটা উপগ্রহ। তার দূরত্ব সাত হাজার কিলোমিটার আয়তন দুই হাজার কিলোমিটার। আর গান হচ্ছে সাউন্ড ওয়েভ—"

সুমন কঠিন মুখে বলল, "চাঁদের দূরত্ব মোটেই সাত হাজার কিলোমিটার না, চার লক্ষ কিলোমিটার, আর চাঁদের ব্যস দুই হাজার কিলোমিটার না সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার।"

বন্যা চোখ বড় বড় করে বলল, "দেখলি? দেখলি? আমি ঠিক বলেছি কী না?"

শাঁওলী এবারে বন্যাকে ধমক দিয়ে বলল, "ব্যস অনেক হয়েছে। সুমনকে আর জ্বালাতন করিস না। ভাগ এখান থেকে।"

তাদের সবার ধারণা ছিল বাজার করে আসার পর সাগর পুরো ব্যাপারটা নিয়ে একেবারে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে থাকবে এবং সেটা নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করে সবার মাথা খারাপ

করে ফেলবে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা হলো তার উল্টো, তাকে দেখে মনে হল সে বুঝি রাজ্য জয় করে এসেছে। রান্না ঘরের মেঝেতে সব কিছু ঢালা হল—লেবু এবং আলু গড়িয়ে চলে যাচ্ছিল সেগুলো টেনে কাছে আনা হল। সাগর একটা চকচকে ইলিশ মাছ দেখিয়ে বলল, "বল দেখি এইটার দাম কত?"

শাঁওলী সাগরকে খুশি করার জন্যে একটু বাড়িয়ে বলল, "আড়াইশ টাকার কম না।"

সাগরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বলল, "একশ পঞ্চাশ। তুমি জান কতো টাকা চেয়েছিল?"

"কতো?"

"তিনশ। তখন জাহিদ ভাই বলল একশ! তুমি চিন্তা করতে পার? আমি তো ভাবলাম মাছওয়ালারা ধরে আমাদের মার দেয় কী না!"

জাহিদ হা হা করে হেসে বলল, "মার দেবে কেন? যত দাম চায় তার তিনভাগের একভাগ বলতে হয়। এটাই নিয়ম। এটা একটা খেলার মতো।"

জাহিদ প্যাকেট থেকে একটা দইয়ের প্যাকেট বের করে বলল, "আমি এক কেজি দই নিয়ে নিলাম। ভাবলাম ভাল খাবার যখন হচ্ছে সাথে দই থাকা উচিত।"

শাঁওলী বলল, "বেশ করেছ। কিন্তু এতো বাজার করে এনেছ—তোমার টাকা কম পড়ে যায় নি তো?"

জাহিদ বলল, " কম পড়েনি। দইটা আমি এনেছি। এটা লিস্টির মাঝে ছিল না। এটা আনলে দোষ নেই।"

শাঁওলী গম্ভীর হয়ে বলল, "না দোষ আছে। জাহিদ ভাই আমি তোমাকে বলেছিলাম—"

জাহিদ বলল, "আরে বাবা আমি তো তাজমহল কিনে আনিনি— এক কেজি দই কিনেছি।"

বাজার করে আনার প্রাথমিক উত্তেজনাটুকু শেষ হবার পর শাঁওলী রান্না করতে শুরু করল। এখানে রান্নার ব্যাপারটি উৎসবের মতো। বন্যা পেঁয়াজ কাটতে শুরু করল, একটু পরেই পিঁয়াজের ঝাঁঝে তার চোখ থেকে টপ টপ করে পানি ঝরতে শুরু করে। সুমন বলল, "ছোটপু, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নাও।"

বন্যা বলল, "মুখ দিয়ে যদি নিঃশ্বাস নেব তাহলে খোদা আমাকে একটা নাক দিয়েছে কেন?"

"না-তা বলছি না। পেঁয়াজের গন্ধটা নাক দিয়ে গেলে একটা গ্ল্যান্ডে রিএকশান হয়। তখন চোখ থেকে পানি বের হয়। মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিলে বের হয় না।"

"তোকে বলেছি। সব জায়গায় সায়েন্স ফলাবি না।"

শাঁওলী বলল, "আহা চেষ্টা করে দেখ না।"

"আমার আর কাজ নেই। ক্যাবলার মতো মুখ হা করে থাকি। এর চাইতে চোখ থেকে পানি ফেলা ভাল।"

সাগর আলু ছিলছে, এব্যাপারে সে বড় ধরনের এক্সপার্ট না ,গোল আলু ছোলার পর চারকোণা হয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে শাঁওলী বলল, "কী হল সাগর! তোর ছিলকের সাথেই তো সব আলু চলে যাচ্ছে। এক কেজি আলু ছিলে তুই দেখি আধ কেজি বানিয়ে ফেলছিস।"

সাগর বলল, "আপু। এইটা হচ্ছে আলু। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এটা কোহিনূর হীরা।"

"কোহিনূর হীরা নয় বলে আলু নষ্ট করবি?"

"আমি নষ্ট করছি না আপু। আমি চেষ্টা করছি।"

ঝুমুরকে ব্যস্ত রাখা নিয়ে সমস্যা—তাই সুমন তাকে নিয়ে চাল আর ডাল থেকে কাঁকড় বাছতে শুরু করেছে। একটু পর পর সে একটা কালচে ডালকে সাবধানে ধরে এনে শাঁওলীকে দেখিয়ে যাচ্ছে। শাঁওলী দুই হাতে ডাক্তারদের অপারেশন করার গ্লাভস পরে মাছ কাটতে বসেছে। এই জিনিসটা সে এখনও ভাল করে শিখে উঠতে পারেনি প্রতিবারই একটা সমস্যা হয়ে যায়। মাছের আঁশ ছাড়ানোর পর মাছ কাটতে গিয়ে শাঁওলী যখন গলদঘর্ম হয়ে গেল তখন রান্নাঘরের দরজায় জাহিদের ছায়া পড়ল। নানা কাজে ব্যস্ত সবাইকে দেখে সে হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, "আমি কী কিছু করতে পারি?"

শাঁওলী বলল, "তুমি যদি মাছ কাটতে পার তাহলে পার। তা না হলে দরকার নেই।"

জাহিদ এগিয়ে এসে বলল, "সেটা আর এমন কী ব্যাপার।"

"তুমি আগে কখনো কেটেছ?"

"না।"

"তাহলে কাছে এসো না। দূরে থাক।"

জাহিদ এসে শাঁওলীর কাছ থেকে ছুরিটা হাতে নিয়ে বলল, "দাও আমার হাতে। কাটাকুটির কাজ তোমার থেকে আমি ভাল পারব।"

দেখা গেল সত্যি সত্যি সে মাছটাকে বেশ ভালভাবেই কেটে ফেলল। শাঁওলী চমৎকৃত হয়ে বলল, "তোমার দেখি অনেক গুণ। বাজার করতে পার মাছ কাটতে পার।"

জাহিদ হা হা করে হেসে বলল, "ভালই বলেছ!"

"এখন হাতটা সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেল— তারপর হাতে একটু আফটার শেভ লাগাও। মাছ কাটলে হাতে যা দুর্গন্ধ হয়!"

"হাত পরে ধোয়া যাবে। এখন বল আর কী করতে হবে।"

"আর কিছু করতে হবে না। তুমি গিয়ে বসো।"

"একা একা বসে থাকতে বোরিং লাগে— এর থেকে তোমাদের সাহায্য করি।"

কাজেই দেখা গেল জাহিদ মহা উৎসাহে বেগুন চাক চাক করে কাটছে তাতে মশলা মাখাচ্ছে, গরম তেলে ভেজে তুলছে। মনে হল অনেকদিন পর সে যেন মনের মতো একটা কাজ পেয়েছে।

রাত্রে খাবার টেবিলে বন্যা শওকতকে বলল, "আব্বু তুমি জাহিদ ভাইকে থ্যাংকস বলো। জাহিদ ভাই আজকে বাজার করে দিয়েছে, মাছ কেটে দিয়েছে, বেগুন ভেজে দিয়েছে।"

শওকত চোখ কপালে তুলে বলল, "সত্যি নাকি?"

শাঁওলী মাথা নাড়ল, বলল, "সত্যি। তুমি এই শুক্রবার ফাঁকি দিয়েছ— বাজার করে দাওনি।"

শওকত অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, "হঠাৎ করে এত জরুরি একটা কাজ পড়ে গেল। আর হবে না—"

শাঁওলী বলল, "আর হলেও চিন্তা নেই। কারণ আজকে জাহিদ ভাই সাগরকে বাজার করার উপরে একটা কোর্স দিয়েছে। সহজ বাজার শিক্ষা, কোর্স নম্বর দুইশ বাইশ, তিন ক্রেডিট। এখন থেকে সাগর বাজার করতে পারবে— তাই না সাগর?"

সাগর মাথা উঁচু করে বলল, "পারবই তো। না পারার কী আছে?"

শাঁওলী জাহিদকে জিজ্ঞেস করল, "কোর্সে পাস করেছে সাগর?"

জাহিদ মাথা নাড়ল, "করেছে। বি প্লাস।"

ঝুমুর বেগুন ভাজা দিয়ে খেতে খেতে মুখ হা করে বলল, "উহ্ ঝাল!"

শাঁওলী বলল, "বেগুন ভেজেছে জাহিদ ভাই। জাহিদ ভাইকে বল।"

জাহিদ বলল, "আমি শুধু ভেজেছি। ঝাল মিষ্টির দায়িত্ব আমার না। এটা অন্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব?

বন্যা জিজ্ঞেস করল, " তাহলে কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব?"

"মিনিস্ট্রি অব মশলা।"

"থাক বাবা—এখন এই আলোচনা, পরে আবার হরতাল ডেকে দিবি।"

খাওয়া শেষ হবার পর জাহিদ হাত মুখ ধুয়ে বলল, "অনেক রাত হয়েছে, আমি এখন যাই।"

শাঁওলী বলল, "কোথায় যাবে?"

"ছোট খালার বাসায়।"

"তুমি একটা কাজ করো।"

" কী কাজ?"

"আজ রাতে এখানে থেকে যাও। বাইরের ঘরে ফ্লোরে তোমাকে একটা বিছানা করে দেই।"

জাহিদ কিছুক্ষণ শাঁওলীর দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে।"

রাত্রে ঘুমানের আগে জাহিদের মশারি টানিয়ে দেওয়ার সময় শাঁওলী নরম গলায় বলল, "জাহিদ ভাই।"

"কী?"

"আমি একটা কথা বলি?"

"বল।"

"তুমি জান একটা মানুষের ভিতরে ভাল খারাপ দুটোই থাকে। কেউ ইচ্ছে করলে অন্য একজনের ভিতর থেকে ভালটা বের করে আনতে পারে আবার কেউ ইচ্ছে করলে খারাপটা বের করে আনতে পারে।"

জাহিদ ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি এই কথা বলছ কেন?"

"বলছি কারণ তুমি সবার ভিতর থেকে শুধু তাদের খারাপটা কেন বের করে আনছ।"

জাহিদ মুখ শক্ত করে বলল, "কারণ আমি মানুষটা খারাপ।"

"এটা রাগের কথা। রাগের কথা বলে লাভ নেই। আমি তোমাকে একটা উপদেশ দেই?"

"কী উপদেশ?"

"তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে?"

"কী চেষ্টা করে দেখব?"

"সবার ভিতর থেকে ভাল জিনিসটা বের করা যায় কী না। আজকে আমাদের সাথে যে রকম করেছ।"

"তোমরা আর আমার ফ্যামিলি এক হল?"

"আমার মনে হয় এক। তুমি চেষ্টা করে দেখনি।"

জাহিদ কেমন জানি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে শাঁওলীর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কীভাবে চেষ্টা করতে হবে?"

"সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে। কালকে তোমার আব্বার সাথে দেখা করে বলতে পার যে কাজটা খুব অন্যায় হয়েছে।"

"অন্যায় হয়নি।"

"হতে পারে, কিন্তু তবু তুমি বলবে তোমার অন্যায় হয়েছে। তোমার আব্বার ভেতরের ভালটুকু বের করার জন্য। বলবে?"

জাহিদ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে, বলব। কিন্তু আমার আব্বা যদি আমাকে ধরে পুলিশের কাছে দেয়?"

"তাহলে আমরা সবাই মিলে তোমার সাথে হাজতে দেখা করতে যাব। আমি কখনো হাজতে কাউকে দেখতে যাইনি।"

জাহিদ আবার শব্দ করে হেসে ফেলল, সে যখন হাসে তখন তাকে ভারি সুন্দর দেখায়। সে জানে না।

শওকত দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, "আমি চারদিনে চলে আসব।"

শাঁওলী বলল, "আব্বু তুমি কোন চিন্তা করো না। তুমি যাও।"

"সত্যিই তোরা ম্যানেজ করতে পারবি তো?"

"একশবার পারব।"

বন্যা কাছে দাঁড়িয়েছিল সে বলল, "রাত্রে বাসায় ঘুমানো ছাড়া তুমি আর কোন কাজটা কর? বাকি সব কাজ তো আমরাই করি।"

শওকত একটু অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, "তা ঠিক। কিন্তু সেটাই কম কী? সবাই এক বাসায় আছি সেটা জেনে তো ঘুমাই।"

"তুমি চিন্তা করো না—" শাঁওলী বলল, "আমরা ম্যানেজ করব।"

"এই দেখিস দেখতে দেখতে চারদিন কেটে যাবে।"

"ওহ! আব্বু—তুমি যাও দেখি।"

শাঁওলীর ধমক খেয়ে শওকত ঘর থেকে বের হল, তার ডান হাতে কালো একটা ব্যাগ, বাম হাতে ছোট একটা ব্রিফকেস। অফিসের জরুরি কাজে তাকে ইন্ডিয়া যেতে হচ্ছে—

শান্তা বেঁচে থাকতে এটি কোন ব্যাপারই ছিল না, কিন্তু আজকাল বাচ্চাদের বাসায় একা রেখে ইন্ডিয়া দূরে থাকুক শহরের বাইরেও যায় না। কিন্তু হঠাৎ করে খুব বাড়াবাড়ি জরুরি কাজ পড়ে গিয়েছে, অন্য কেউ গেলে হবে না, শওকতকেই যেতে হবে। তার সাথে আরো দু'জন যাচ্ছে কিন্তু তারা যাচ্ছে শওকতকে সাহায্য করার জন্যে।

শওকত ছাড়া প্রথম রাতটি অবশ্য শাঁওলী সবাইকে নিয়ে একটু ভয়ে ভয়েই কাটাল। ঘুমানোর আগে দরজা ভাল করে বন্ধ করা হয়েছে কী না সেটা সবাই কয়েকবার পরীক্ষা করে দেখল। খাওয়ার ঘরে রাত্রি বেলা বাতি জ্বালিয়ে ঘুমালো সবাই। কোন কারণ নেই তবুও সবাই কথা বলল আস্তে আস্তে। রাত্রি বেলা শাঁওলীর ঘুম একটু পরে পরে ভেঙে গেল, মনে হল কেউ বুঝি বারান্দায় ফিসফিস করে কথা বলছে কিংবা নিঃশব্দে হেঁটে বেড়াচ্ছে। রাতটা কোনভাবে কেটে যাবার পর আর কে'ন সমস্যা হলো না— অবশ্য ঝুমুরকে যদি সমস্যা বলা না হয়। দশ মিনিট পর পর সে জিজ্ঞেস করতে লাগল, "আব্বু কবে আসবে?"

ভুল করে শাঁওলী বলে ফেলল আব্বু তার জন্যে নিশ্চয়ই ইন্ডিয়া থেকে একটা ফ্রক নিয়ে আসবে তখন তার ফল হলো আরও ভয়ানক। ফ্রকটি কী রংয়ের হবে, সেখানে কী ডিজাইন থাকবে, সেরকম ফ্রক কী আর কোথাও আছে কী না এই ধরনের প্রশ্ন শুনে শুনে বাসার সবার মাথা খারাপ হয়ে গেল।

দুপুর বেলা সবাই স্কুল থেকে ফিরে এসে খেতে বসেছে তখন শাঁওলী লক্ষ করল সাগর ঠিক করে খাচ্ছে না প্লেটের ভাতগুলো হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছে। শাঁওলী ধমক দিয়ে বলল, "কী হল সাগর খাচ্ছিস না কেন?"

সাগর বলল, "খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"কেন? কী খেয়ে এসেছিস?"

"কিছু খাইনি।"

"তাহলে?"

"জানি না। মাথাব্যথা করছে।"

তখন শাঁওলী ভাল করে তাকিয়ে দেখল, সাগরকে কেমন জানি বিবর্ণ দেখাচ্ছে, ঠোঁটগুলো শুকনো, চোখের নিচে কেমন জানি কালি। সে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, "তোর কী শরীর খারাপ লাগছে নাকি?"

শরীর খারাপ হওয়াটা খুব একটা অন্যায় ব্যাপার এরকম ভাব করে সাগর বলল, "না না। শরীর খারাপ কেন হবে?"

শাঁওলী বলল, "দেখি।" সে কাছে এগিয়ে গিয়ে কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠল, জ্বরে সাগরের সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করে ভয়ে শাঁওলীর পেটের মাঝে পাক খেয়ে উঠে।

শাঁওলীর মুখ দেখে সবাই বুঝতে পারে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। ভয়ে ভয়ে বন্যা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে আপু?"

শাঁওলী খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে বলল, "মনে হয় একটু জ্বর উঠেছে।"

"জ্বর?" সাগর খুব অবাক হয়ে নিজের কপালে, গালে হাত দিয়ে উত্তাপটুকু বোঝার চেষ্টা করে বলল, "কোথায় জ্বর?"

সুমন গম্ভীর হয়ে বলল, "নিজের জ্বর হাত দিয়ে নিজে বোঝা যায় না। টেম্পারেচার—"

বন্যা সাগরের শরীরে হাত দিয়ে বলল, "সর্বনাশ।"

শাঁওলী ধমক দিয়ে বলল, "সর্বনাশের কী আছে? মানুষের জ্বর উঠে না?"

সাগরকে এখন কেমন জানি ফ্যাকাসে দেখায়, মনে হল সে খুব ভয় পেয়ে গেছে। শান্তার তীক্ষ্ণ খবরদারির কারণেই বা অন্য যে কোন কারণেই হোক এই বাসায় বাচ্চাদের অসুখ-বিসুখ হয়েছে খুব কম। আর যখন হঠাৎ করে কারো অসুখ হয়েছে শান্তা তখন সেই ব্যাপারটি নিয়ে হৈচৈ করে এমন একটি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে অসুখের স্মৃতির সাথে সব সময়েই আদর যত্ন সেবা শুশ্রূষার একটা মধুর স্মৃতি মিশে রয়েছে। ডাক্তার যদি বলেছে ছয় ঘণ্টা পর পর ওষুধ দিতে, শান্তা না ঘুমিয়ে জেগে বসে থাকত ঠিক ছয় ঘণ্টা পর যেন ওষুধ দিতে পারে— ঘড়ি ধরে সে কখনো এক মিনিট দেরি করেনি। বাচ্চাদের যখনই কারো অসুখ হয়েছে তারা যখনই চোখ খুলেছে দেখেছে মাথার কাছে শান্তা উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে।

এখন শান্তা নেই, অসুখ হলে কী করতে হয় তাদের কারো জানা নেই। শুধু তাই নয় শওকতও গিয়েছে ইন্ডিয়া শাঁওলীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কিন্তু সে মুখে সেটা প্রকাশ করল না, সাগরকে বলল, "যা সাগর, বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাক।"

সাগর আপত্তি করে বলল, "আমার কিছু হয়নি।"

"তুই আগে বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাক বলছি।"

সাগর খুব অনিচ্ছার ভঙ্গি করে হাত ধুয়ে টেবিল থেকে পানির গ্লাসটা নিয়ে এক ঢোক পানি খেয়েই হড় হড় করে বমি করে দিল। ব্যাপারটি ঘটল এত হঠাৎ করে যে কেউ তার জন্যে এতটুকু প্রস্তুত ছিল না। সাগর সেখানেই বসে পড়ে এবং এক ধরনের আতংক নিয়ে পেট থেকে বের হয়ে আসা খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। খাবার টেবিলে যারা ছিল তারা সবাই বিস্ফারিত চোখে সাগরের দিকে তাকিয়ে রইল। অসুখ বিসুখ দেখে তাদের অভ্যাস নেই। শান্তা নেই শওকতও নেই এরকম সময়ে কারো অসুখ হলে কী করতে হয় সে সম্পর্ক কারো কোন ধারণা নেই।

সাগর দ্বিতীয়বার বমি করার জন্যে প্রস্তুতি নেয় এবং শাঁওলী তখন ছুটে গিয়ে সাগরের মাথাটি ধরল, তার আবছা ভাবে মনে পড়েছে বমি হলে সব সময় শান্তা এভাবে তার মাথাটিকে ধরেছে। সাগরের পেটে বমি হওয়ার মতো এমন কিছু খাবার ছিল না কিন্তু তারপরেও সে বারবার বমির দমকে সেগুলো বের করে ভয়ার্ত এক ধরনের দৃষ্টিতে শাঁওলীর দিকে তাকাল। শাঁওলী তাকে ধরে বলল, "আয়, বাথরুমে কুলি করে বিছানায় শুয়ে পড়বি।"

সাগরকে বিছানায় শুইয়ে দেবার পর সে কাঁপতে লাগল এবং দেখতে দেখতে তার জ্বর আরো বেড়ে গেল। বন্যা আর সুমন মিলে ডাইনিং রুমটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করে— কারো আর খাওয়ার কথা মনে নেই। ঝুমুর বড় বড় চোখ করে বন্যাকে জিজ্ঞেস করল, "বন্যাপু, ভাইয়া কী এখন মরে যাবে?"

বন্যা আঁৎকে উঠে বলল, "চুপ কর গাধা। মরে যবে কেন?"

কেন মরে যাবে সেটা নিয়ে ঝুমুরের একটা ভাল যুক্তি ছিল কিন্তু বন্যার রেগে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে সেটা বলার সাহস হল না।

অনেক খুঁজে পেতে থার্মোমিটার বের করে সেটা দিয়ে সাগরের জ্বর মেপে দেখা গেল তার জ্বর একশ তিন ডিগ্রি। নিঃসন্দেহে এটা অনেক জ্বর।

শাঁওলী কী করবে বুঝতে পারে না। তার ইচ্ছে হল বসে বসে কাঁদে। আম্মু বেঁচে থাকলে পুরো ব্যাপারটি কী সহজেই না সমাধান হয়ে যেতো। অসুখ হলে ডাক্তার দেখাতে হয় এবং অনেক বেশি অসুখ হলে হাসপাতালে নিতে হয় এটুকুই মাত্র সে জানে। এটা কী অসুখ নাকি অনেক বেশি অসুখ? সাগরকে কী ডাক্তার দেখাতে হবে নাকি হাসপাতালে নিতে হবে? হাসপাতালে নিলেই কী ডাক্তাররা রোগীদের দেখে? পত্রিকায় যে মাঝে মাঝে খবর বের হয় রোগীরা বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে সেগুলো কী সত্যি না মিথ্যা? শাঁওলী ফ্যাকাসে মুখে সাগরের মাথার কাছে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পর বন্যা সুমন আর ঝুমুর পা টিপে টিপে ঘরে এসে ঢুকল, তিনজন সাগরের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। ঝুমুর আবার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "ভাইয়া কী মরে যাচ্ছে?"

শাঁওলী চমকে উঠে, কী অলুক্ষণে কথা! মাথা নেড়ে বলল, "না। ওষুধ খেলেই জ্বর ভাল হয়ে যাবে।"

"তাহলে ওষুধ দাও।"

"হ্যাঁ দিব।"

"কখন দিবে?"

"ডাক্তার দেখলেই দিব।"

ঝুমুর আলোচনাটি আরো চালিয়ে যেতে চাইছিল কিন্তু শাঁওলী থামিয়ে দিয়ে বলল, "এখন কথা বলিস না। জ্বর হলে কথা বলতে হয় না।"

জ্বর হলে কেন কথা বলতে হয় না সেটা নিয়েও ঝুমুর আরেকটা আলোচনা চালিয়ে নিতে চাইছিল কিন্তু ঘরের থমথমে পরিবেশ দেখে আর সাহস করল না। শাঁওলী বন্যা আর সুমনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোরা একটা ডাক্তার ডেকে আনতে পারবি?'

বন্যা ইতস্তত করে বলল, "ডাক্তার কেমন করে ডেকে আনে?'

শাঁওলী নিজেও ব্যাপারটা ভাল করে জানে না, তবুও আন্দাজ করে বলল, "মোড়ে ফার্মেসিতে দেখিসনি একজন ডাক্তার বসে? তাকে বলবি সাথে আসতে। সাথে করে নিয়ে আসবি।"

বন্যা এবং সুমন তবুও ইতস্তত করছে দেখে বলল, "ঠিক আছে, তোরা তাহলে সাগরের মাথার কাছে বস, আমি নিয়ে আসি।"

বন্যা সাগরের ঘোলা চোখ এবং জ্বরতপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "না আপু তুমি থাকো, আমরা ডাক্তার ডেকে আনি।"

বন্যা আর সুমন বের হয়ে যাবার পর শাঁওলী আবার সাগরের জ্বর মেপে দেখল, জ্বর আগের থেকে আরো একটু বেড়েছে। শাঁওলী একটু পর পর জিজ্ঞেস করছিল তার কেমন লাগছে সাগর উত্তরে কথা বলতে চায়নি খুব পিড়াপীড়ি করলে বলেছে মাথাব্যথা করছে।

বন্যা আর সুমন ফিরে এলো প্রায় আধঘণ্টা পরে— কোন ডাক্তার ছাড়াই। শাঁওলী অবাক হয়ে বলল, "কী হল ডাক্তার কই?"

বন্যা বলল, "ডাক্তার ওষুধ দিয়ে দিয়েছে।"

"রোগী না দেখে ওষুধ দিয়ে দিল মানে?"

"এখন অনেক রোগীর ভিড়—আসতে পারবে না। বলেছে জ্বর যদি না কমে তাহলে রাত্রি বেলা আসবে।"

"এটা কী রকম ডাক্তার, ডাকলে আসবে না?"

সুমন বলল, "এখন ডাক্তাররা বাসায় আসে না। এখন রোগীদের ডাক্তারের কাছে নিতে হয়।"

শাঁওলী বলল, "দেখি কি ওষুধ দিয়েছে।"

বন্যা ওষুধগুলো দিয়ে বলল, "দুই রকম ওষুধ, একটা বমির জন্যে আরেকটা জ্বরের জন্যে।"

সুমন বলল, "ডাক্তার বলল, নিশ্চয়ই ভাইরাস। সবার হচ্ছে। বেশি করে ফ্লুইড খেতে বলেছে।"

ঝুমুর জিজ্ঞেস করল, "ফ্লুইড কী?"

"ফ্লুইড হচ্ছে পানি, সরবত, কোল্ড ড্রিংকস এইসব।"

"ও।" ঝুমুর আবার জিজ্ঞেস করল, "আমি কী ভাইয়ার জন্যে ফ্লুইড নিয়ে আসব?"

"যা নিয়ে আয়।"

ঝুমুর কাজ করার একটা সুযোগ পেয়ে রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল।

ওষুধগুলো নিয়ে সাগরকে খাওয়াতে গিয়ে সবাই একটা বিচিত্র জিনিস আবিষ্কার করল, সেটি হচ্ছে সাগর টেবলেট খেতে পারে না। সে জীবনে কখনো টেবলেট খায়নি। শাঁওলী চোখ কপালে তুলে বলল, "তুই টেবলেট খেতে পারিস না?"

সাগর না বোধক ভাবে মাথা নাড়ল। ব্যাপারটি শান্তা জানত আর কেউ জানে না। এতদিন জানার প্রয়োজনও হয়নি।

"আগে যখন অসুখ হয়েছে তখন তুই কী করেছিস?" প্রশ্নটি করেই শাঁওলী বুঝতে পারল এটি জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই, কারণ আগে যখন কারো অসুখ হয়েছে তখন শান্তা বেঁচেছিল এবং যখন শান্তা বেঁচেছিল তখন তাদের কারো কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না সবকিছু শান্তা করেছে।

সাগর মাথা নেড়ে ভয় পেয়ে বলল, "টেবলেট কীভাবে খায়?"

"মুখের মাঝে দিয়ে এক ঢোক পানি খেতে হয়।"

সাগর খুব অনিচ্ছা নিয়ে রাজি হলো, জিবের ওপর একটা টেবলেট রেখে সে এক ঢোক পানি খেয়ে আবিষ্কার করল, পানিটুকু খাওয়া হয়ে গেছে কিন্তু টেবলেটটি ঠিক আগের জায়গাতেই আছে। শাঁওলী অবাক হয়ে বলল, "এটা কী করে সম্ভব?"

সাগর ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করার কোন চেষ্টা করল না, মুখ কুচঁকে বলল, "ছিঃ গন্ধ!" তারপর থু থু করে টেবলেটটি ফেলে দিল। সে আর কিছুতেই টেবলেট খেতে রাজি হল না— বলল আরেকবার চেষ্টা করলেই সে বমি করে দেবে। বমি বন্ধ করার টেবলেট খেয়ে যদি কেউ বমি করে দেয় সেটি কোন কাজের কথা হতে পারে না।

কাজেই সাগর কোন ওষুধ না খেয়ে জ্বর গায়ে শুয়ে রইল এবং শাঁওলী একটু পরে পরে জ্বর মেপে দেখতে লাগল। সেটি কখনো একশ তিন, কখনো একশো তিন থেকে বেশি

কখনো একটু কম। একবার দেখা গেল আটানব্বই সবাই খুব আশান্বিত হওয়ার পর আবিষ্কার করল থার্মোমিটার ঠিক করে লাগানো হয়নি।

সন্ধ্যেবেলার দিকে শাঁওলী অনেক বলে কয়ে সাগরকে আবার একটা টেবলেট খাওয়ানের জন্যে রাজি করল। টেবলেটটা জিবের ওপর রেখে যতবার সে পানি খায় ততবার শুধু পানিটুকু পেটে যায় কিন্তু টেবলেটটা ঠিক মুখের মাঝে রয়ে যায়। শাঁওলী একবার আঙুল দিয়ে গলার ভেতর ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সাগর তখন দম আটকে মারা যাচ্ছে সেরকম একটা ভঙ্গি করে এমন ভয়ঙ্কর ভাবে কাশতে শুরু করল যে শাঁওলী আর সাহস পেলো না। শাঁওলী ভেবেই পেল না চৌদ্দ-পনেরো বছরের একটা ছেলে কেমন করে টেবলেট খাওয়া না শিখে এতো বড় হয়ে যেতে পারে।

অন্যদিন সন্ধ্যে হলেই সবাই পড়তে বসে যায়, আজ সাগরের জ্বর বলে সবাই সেটা নিয়ে ব্যস্ত। এই মুহূর্তে পুরোপুরি উত্তেজনাটুকু টেবলেটটা খাওয়ানো নিয়ে। টেবলেটের বদলে কোন একটা ইনজেকশান দেয়া যায় কী না সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তখন সুমন প্রস্তাব করল টেবলেটটা গুঁড়ো করে পানি মিশিয়ে খাইয়ে দিতে। শাঁওলীর তখন হঠাৎ করে মনে পড়ল যে শান্তাও তাই করতো ছোট কাউকে টেবলেট খাওয়াতে হলে সেটা গুঁড়ো করে চিনি মিশিয়ে খাইয়ে দিত। এই সহজ জিনিসটা কেন আগে মনে পড়েনি সেটা ভেবেই সে এখন অবাক হয়ে যায়।

টেবলেট গুঁড়ো করাও খুব সহজ হলো না নানা রকম পরীক্ষা –নিরীক্ষা করে এবং বেশ কয়েকটা টেবলেট নষ্ট করার পর দেখা গেল চায়ের চামুচ দিয়ে চাপ দিয়ে টেবলেট গুঁড়ো করা যায়। মিহি করে গুঁড়ো করে একটু পানি মিশিয়ে সেটাকে সাগরের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সাগর মুখ বিকৃত করে সেটা খেয়ে তাড়াতাড়ি এক ঢোক পানি খেয়ে নিল। পানির গ্লাস নিয়ে কাছেই ঝুমুর দাঁড়িয়েছিল যদিও সে এখন পানিকে আর পানি বলছে না, ফ্লুইড বলছে। সাগরের মুখ ভঙ্গি দেখে মনে হলো সে বুঝি এক্ষুণি পুরোটা ওয়াক করে উগরে দেবে কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত সে ধরে রাখল। তখন সাগরকে ঘিরে থাকা সবাই আনন্দধ্বনি করে উঠে হাততালি দিতে শুরু করল। সেটা দেখে সাগর হঠাৎ একটু লজ্জা পেয়ে গেল।

টেবলেট যেহেতু খাওয়া হয়েছে এখন নিশ্চয়ই জ্বর কমে যাবে কাজেই প্রতি দশ মিনিট পর পর থার্মোমিটার দেখা শুরু হলো— থার্মোমিটারে সূক্ষ্ম পারদের রেখাটি শাঁওলী ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না কিন্তু সেটি আবার কেউ স্বীকারও করতে চায় না। জ্বরটি এসেছিল হঠাৎ করে কিন্তু নামলো বেশ সাড়া শব্দ করে প্রথমে সাগরের হঠাৎ গরম লাগতে থাকে তারপর শরীর ভিজে গেল ঘামে, থার্মোমিটার দিয়ে দেখা গেল পারদ নিচে নেমে এসেছে।

সাগরের পিছনে বালিশ দিয়ে সোজা করে বসানো হলো— তার মাথাব্যথা নেই কিন্তু কেমন জানি হালকা হালকা লাগছে। কি খেতে চায় জিজ্ঞেস করতেই সাগর প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল, সে কিছু খাবে না। খেতে ইচ্ছে করছে না।

শাঁওলী ধমক দিয়ে বলল, "খাবি না মানে? অসুখ-বিসুখ হলে আরও বেশি করে খেতে হয় জানিস না?"

ঝুমুর জিজ্ঞেস করল, "কেন বেশি খেতে হয় আপু?"

"শরীরের জার্মগুলোর সাথে ফাইট করতে হবে না?"

"জার্ম না, ভাইরাস।" সুমন শুদ্ধ করিয়ে দিল।

বন্যা বলল, "একই কথা।"

সুমন বলল, "না, এক কথা না। ভাইরাস হচ্ছে অনেক ছোট মাইক্রোসকোপেও দেখা যায় না। আর জার্ম হচ্ছে ব্যাক্টেরিয়া–"

বন্যা বলল, "তুই চুপ করবি? না হয় মাথায় একটা গাট্টা দিব।"

সুমন জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় সহজে চুপ করে না কিন্তু বন্যা শারীরিকভাবে আঘাত করার ভয় দেখালে সাধারণত সেটা ঘটিয়ে ফেলে তাই সে চুপ করে গেল। শাঁওলী জিজ্ঞেস করল, "বল, কী খাবি? রুটি টোস্ট করে দেব জেলি দিয়ে? নাকি ভাত রান্না করে আলুভাজা দিয়ে দেব? চিকন চিকন করে কেটে আলু ভাজা?"

সাগার কাতর গলায় বলল, "প্লিজ আপু, একেবারে খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"খেতে আবার কারো ইচ্ছে করে নাকি? জোর করে খেতে হয়। মনে নেই আম্মু কী বলতো এক বেলা না খেলে কী হয়?"

বন্যা বলল, "চড়ুই পাখির সমান রক্ত কমে যায়—"

সুমন বলল, "কথাটা বেশি সায়েন্টিফিক না। কারণ—" বন্যা এমন ভাবে সুমনের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল যে সুমন কারণটা ব্যাখ্যা করার সাহস পেলো না।

সাগরকে আগে কিছু খাওয়ানোর পর আবার তাকে ওষুধ খাওয়ানোর সময় হল। টেবলেটের গুঁড়ো না খাইয়ে কেমন করে তাকে সত্যিকার টেবলেট খাওয়ানো শেখানো যায় সেটা নিয়ে রীতিমত গবেষণা শুরু হয়ে গেল। বন্যা বলল, "একেবারে গলার ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেই হয়, কোৎ করে গিলে নেবে।"

শাঁওলী জিজ্ঞেস করর, "গলার ভিতরে ঢোকাবে কে?"

"কেন? ভাইয়া নিজে।"

"তোর ধারণা সাগর সেটা করতে পারবে? বমি করে, কেশে, চিৎকার করে, দম বন্ধ হয়ে, শ্বাস নালীতে আটকিয়ে একটা ম্যাসাকার করে ফেলবে।"

" তাহলে?"

সুমন একটা বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব করল, বলল, "রুটির টুকরাকে গোল করে পাকিয়ে টেবলেটের মতো করা যাক। সেটা গিলে প্র্যাকটিস করুক। যখন প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তখন ট্যাবলেট খেতে পারবে।"

শাঁওলী বলল, "আইডিয়াটা খারাপ না। যা দেখি ফ্রিজ খুলে এক টুকরা রুটি নিয়ে আয়।"

ঝুমুর বলল, "আমি নিয়ে আসি? আমি নিয়ে আসি?"

কাজেই শাঁওলীকে বলতে হল, "নিয়ে আয়।" এবং তাকে পিছু পিছু যেতে হলো রুটির টুকরোটা আনতে সাহায্য করার জন্যে।

রুটির টুকরা পাকিয়ে টেবলেটের মতো করা হল, সাগরকে সেগুলো খাওয়ানো হলো— সাগর যখন মোটামুটিভাবে শিখে গেল তখন ঠিক একই কায়দায় তাকে টেবলেট খেতে দেয়া হলো। আংগুল দিয়ে ঠেলে টেবলেটটা রাখা হলো গলার কাছাকাছি, তারপর সেটা গেলার চেষ্টা করে সাগর বড় এক ঢোক পানি খেয়ে মুখ বিকৃত করল। তাকে ঘিরে চারপাশে প্রবল উত্তেজনা, শাঁওলী উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করল, "গিলেছিস?"

সাগর মাথা নেড়ে মুখ হা করল, দেখা গেল জিবের ওপর টেবলেটটা বহাল তবিয়তে বসে আছে।

দ্বিতীয়বার আবার চেষ্টা করল, মনে হলো এবারে বুঝি হয়ে গেছে কিন্তু মুখ খোলার পর দেখা গেল ট্যাবলেট ঠিক আগের জায়গাতেই আছে। তৃতীয় এবং চতুর্থবার চেষ্টা করার পর শাঁওলী বলল, "ব্যাস অনেক হয়েছে। আর দরকার নেই।"

ঝুমুর জানতে চাইল, "কেন দরকার নেই আপু?"

"সাগর যখন বড় হয়ে বিয়ে করবে তখন ওর বউ তাকে টেবলেট খেতে শিখাবে। আমি পারব না।"

বন্যা হি হি করে হেসে বলল, "কী মজা হবে না আপু? শ্বশুর-শাশুড়ি গ্লাসে পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। বউ মুখের মাঝে টেবলেটটা দিবে আর সব শালা- শালিরা হাততালি দেবে।"

দৃশ্যটা কল্পনা করে সাগর পর্যন্ত হেসে ফেলল।

দু'দিনের মাঝে সাগরের জ্বর কমে গেল। তাকে ডাক্তারের কাছেও নিতে হলো না—যে রকম হঠাৎ করে এসেছে সে রকম হঠাৎ করে সেরে গেল। সাগরকে অবশ্য টেবলেট গুঁড়ো করেই খাওয়াতে হলো অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত তাকে আস্ত টেবলেট খাওয়ানো শেখানো গেল না।

শওকত আরো একদিন পর ফিরে এলো। একা একা থেকে তাদের অভ্যাস নেই কারো আর দিন কাটছিল না। বিকেলের ফ্লাইট, দুপুর থেকে সবাই অপেক্ষা করতে শুরু করে। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা হলো, আব্বুর জন্য তার প্রিয় জিনিস (লাল শাক এবং আলু ভর্তা) রান্না করা হলো, গত চারদিনের পত্রিকা আলাদা করে রাখা হলো। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেলো তবু শওকতের দেখা নেই। অপেক্ষা করে করে যখন অধৈর্য হয়ে শেষ পর্যন্ত দুশ্চিন্তা শুরু করে দিল তখন দেখা গেল অফিসের গাড়ি বাসার সামনে থেমেছে, শওকত তার ব্যাগ নিয়ে নেমে আসছে।

শওকত ঘরে ঢোকার আগেই ঝুমুর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, "আব্বু তুমি জান কী হয়েছিল?"

"কী হয়েছিল ঝুমুর সোনা?"

"ভাইয়ার এতো অসুখ হয়েছিল যে আমরা সবাই ভেবেছিলাম ভাইয়া মারা যাবে।"

শওকত শিউরে উঠে ফ্যাকাসে মুখে সাগরের দিকে তাকাল, সাগর লজ্জা পেয়ে বলল, "তুমি ঝুমুরের কথা শুনো না।"

শওকত ভয়ে ভয়ে বলল, "কিছু হয়েছিল নাকি?"

"একটু জ্বর হয়েছিল।"

ঝুমুর সাথে সাথে প্রতিবাদ করে বলল, "একটু না আব্বু অনেক বেশি। ভাইয়া ওয়াক করে বমি করে দিয়েছিল। আরেকটু হলে আমার ওপর বমি করে দিতো। তাই না আপু?"

শাঁওলীকে সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়তে হল। শওকত ব্যাগ রেখে চেয়ারে বসে গলার টাই খুলতে খুলতে বলল, "মাত্র কয়েকদিনের জন্যে গেছি তার মাঝেই এতো কিছু ঘটে গেল?"

অন্য কেউ কিছু বলার আগেই ঝুমুর মাথা নাড়ল, "ভাইয়া ওষুধ খেতে পারে না। টেবলেট মুখে দিয়ে পানি খায় তখনও টেবলেট জিবের ওপর থাকে। তাই না সুমন ভাইয়া?"

সুমন এবং অন্য সবাই এই তথ্যটির সত্যতা স্বীকার করে মাথা নাড়ল। ঝুমুর মুখ গম্ভীর করে বলল, "এই জন্যে আমরা সবাই ভেবেছিলাম ভাইয়া মরে যাবে। ওষুধ না খেলে মানুষ মরে যায় না আব্বু?"

জন্ম এবং মৃত্যুর মতো গুরুতর ব্যাপার নিয়ে শওকত বেশি উচ্চবাচ্য না করে ঝুমুরকে কাছে টেনে নিতেই ঝুমুর আলাপের বিষয় পরিবর্তন করে বলল, "আমার জন্যে ইন্ডিয়া থেকে কী এনেছ আব্বু?"

বন্যা ধমক দিয়ে বলল, "ওহ! ঝুমুর—তুই তোর মুখটা একটু বন্ধ করবি? আব্বুকে একটু কাপড়-জামা বদলে হাত-মুখ ধুয়ে নিতে দিবি?"

শওকত বলল, "আহা-হা, দে না একটু কথা বলতে এই চারদিন শুধু কাজের কথা শুনে কান পচে গেছে।"

ঝুমুর রাজ্য জয় করার ভঙ্গি করে বন্যার দিকে তাকাল।

সন্ধ্যেবেলা শওকত বাসায় এলো একজন বয়স্ক মানুষকে নিয়ে, মানুষটির বড়ো একটা ব্যাগ শওকত টেনে আনছে দেখে সবাই বুঝে গেল, মানুষটি কয়েকদিন এখানে থাকবে। তাদের বাসায় কাজের কোন মানুষ নেই অনেক চেষ্টা চরিত্র করে কয়েকদিন আগে আমেনার মা নামে একজন মহিলাকে ঠিক করা হয়েছে সে সকাল বেলা দুই ঘণ্টার জন্যে এসে ঝড়ের বেগে কিছু কাজ করে দেয়। শাঁওলী এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে এই শক্ত সমর্থ মহিলার কাজ দেখে। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই এই একজন মানুষের দুই ঘণ্টার কাজ তাদের সবার কাজ কমিয়ে দিয়েছে। তবুও বাইরের কোন মানুষ এখানে কয়েকদিন থাকার জন্যে এলে সবার খুব সমস্যা হয়, শওকত সেটা জানে কাজেই তার মুখে এক ধরনের অপরাধী ভাব। ছেলে মেয়েদের ডেকে বলল, "এই হচ্ছে তোদের আফতাব চাচা। কিশোরগঞ্জ থাকেন। তোদের দেখতে এসেছেন।"

শাঁওলী প্রথমে এবং তাকে দেখে অন্য সবাই সালাম দিল—যদিও কেউ ঠিক বিশ্বাস করল না যে বয়স্ক মানুষটি তাদের দেখতে এসেছেন। শওকত বলল, "তোদের আফতাব চাচা কয়দিন থাকবেন, শাঁওলী মা তুই একটু ঘরটা ঠিক করে দে।"

তাদের বাসায় অতিথির জন্যে আলাদা কোন ঘর নেই, কাজেই শাঁওলী তার নিজের ঘরে বিছানা ঠিক করে দিল। এই কয়দিন সে বসার ঘরে মেঝেতে বিছানা পেতে ঘুমাবে—সত্যি কথা বলতে কী বিছানায় ঘুমানো থেকে মেঝেতে বিছানা পেতে ঘুমাতেই তার বেশি ভাল লাগে।

আফতাব চাচা মানুষটির কয়েকটা বৈশিষ্ট্য কিছুক্ষণের মাঝেই সবার চোখে ধরা পড়ল তার প্রথমটি হচ্ছে যে বাংলা ভাষায় যে ওকার আছে সেটা তিনি জানেন না। কাপড় বদলে লুঙ্গি এবং পাঞ্জাবি পরে বের হয়ে বললেন, "বাথরুমটা কুন খানে?"

বাথরুমটা দেখিয়ে দেবার পর আফতাব চাচা অনেক শব্দ করে হাত-মুখ ধুয়ে বের হয়ে বললেন, "এই খানে কিশুরগঞ্জের মতো শীত পড়ে নাই।"

তোয়ালে দিয়ে শব্দ করে হাত-মুখ মুছতে মুছতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শওকতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "জায়গাডা কেমুন? চুর ডাকাইতের উৎপাত আছে?"

শওকত বলল সেরকম উৎপাত নেই। আফতাব চাচা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, "তুমার বাসাডা সুন্দর। অনেক আলু বাতাস। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কুনু পুকা-মাকড় নাই।"

আফতাব চাচার কথাবার্তা শুনে প্রথমে বন্যা এবং সাগর খুকখুক করে হাসাহাসি শুরু করলেও কিছুক্ষণের মাঝেই বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেল।

আফতাব চাচার দুই নম্বর বৈশিষ্ট্যটাও তারা কিছুক্ষণের মাঝে আবিষ্কার করল, তিনি খুব ধার্মীক মানুষ। নামায পড়তে পড়তে তার কপালে কালো দাগ হয়ে গেছে সেটা দেখেই আন্দাজ করা উচিত ছিল। খাবার টেবিলে রসূলের সুন্নত বলে তিনি তার প্লেট থেকে এমন ভাবে চেটেপুটে ভাত খেলেন যে প্লেটটা চকচক করতে লাগল। খেতে খেতে তিনি নানা ধরনের ধর্মের কথা বলতে লাগলেন, তবে কোন একটি বিচিত্র কারণে তার ধর্মের কথাগুলো হলো এক ধরনের হিসাবের মতো, এক রাকাত নামায না পড়লে কতো বছর দোজখে থাকতে হয়, একবার মুরুব্বিকে সালাম দিলে কতগুলো নেকি হয়, একজন এতিমের মাথায় হাত বুলালে কতো সংখ্যক সওয়াব হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। আফতাব চাচার এই হিসাব থেকে সুমনের পেটের ভিতরে প্রশ্ন ভুটভাট করেত শুরু করল কিন্তু শাঁওলী চোখ পাকিয়ে থাকার কারণে সেটা জিজ্ঞেস করার সাহস পেলো না।

আফতাব চাচার তিন নম্বর বৈশিষ্ট্যের কথা সবাই টের পেলো পরদিন সকাল বেলায়। দরজায় শব্দ হয়েছে শুনে সাগর দরজা খুলে দেখলো, কম বয়সী একজন মহিলা ছোট একটা বাচ্চা কোলে দাঁড়িয়ে আছে। সাথে সাত আট বছরের আরও একটা ছেলে। মা এবং ছেলে দুজনেই নতুন ক্যাটক্যাটে এক রকমের সাদা কাপড় পরে আছে। ছেলেটার মাথা কামানো এবং চোখে মুখে এক ধরনের উদাস উদাস ভাব, মহিলাটির চেহারা অসহায় এবং অপরাধীর মতো। শুধুমাত্র কোলের বাচ্চাটির চেহারার মাঝে এক ধরনের হাসি-খুশির ভাব আছে। সাগরকে দরজা খুলতে দেখে বাচ্চাটি তার দাঁতহীন মাড়ি বের করে একটা হাসি উপহার দিল। সাগর এই বিচিত্র পরিবারটির দিকে তাকাতেই সাত আট বছর বয়সের ছেলেটি প্রায় মুখস্থ বলার মতো করে বলল, "আমার বাবা মারা গেছে দুই দিন আগে। আমাদের কিছু সাহায্য করেন।"

সাগর কম বয়সী মহিলাটির দিকে তাকাতেই মহিলাটি কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ করে থেমে মাথা নিচু করল, সাগর দেখল মহিলাটি কিছু বলার চেষ্টা করছে কিন্তু বলতে পারছে না। যারা রাস্তাঘাটে ভিক্ষে করে তারা খুব সহজেই সাহায্য চাইতে পারে, যারা এ ব্যাপারে অভ্যস্ত না তাদের জন্যে ব্যাপারটি খুব কঠিন। এমনিতেই সাগরের মন খুব নরম, হঠাৎ করে এরকম একটা পরিবারকে দেখে তার মন আরও নরম হয়ে গেল। সে ভেতরে গিয়ে শাওলীকে নিচু গলায় বলল, "আপু তোমার কাছে টাকা আছে।"

শাঁওলী কেতলি থেকে চা ঢালতে ঢালতে বলল, "কী করবি?"

সাগর ইতস্তত করে বলল, "একজন মহিলা তার বাচ্চাদের নিয়ে এসেছে। বাচ্চাটা বলছে তার বাবা মারা গেছে—"

শাঁওলী চোখের কোনা দিয়ে সাগরকে দেখল, বাসার সবাই জানে তার বুকটিতে রয়েছে একটা অত্যন্ত কোমল হৃদয়, কাজেই সামনা সামনি একজন মহিলা বাচ্চা কোলে দাঁড়িয়ে থাকলে সে যে খুব বিচলিত হবে বলাই বাহুল্য। শাঁওলী জিজ্ঞেস করল, "কতো টাকা?"

সাগর গলা নামিয়ে বলল, "পঞ্চাশ একশ—"

দু'জনের একজনও লক্ষ্য করেনি যে আফতাব চাচা খুব মনোযোগ দিয়ে তাদের দু'জনের কথা শুনছিলেন, এবারে গলা খাকাড়ি দিয়ে বললেন, "দান-খয়রাত করা খুব নেকির কাজ। তবে একজনকে এতো টাকা দেওয়া ঠিক না। যতো বেশি মানুষকে দেয়া যায় তত সওয়াব। এই টাকাটা ভাংতি করে জুম্মার পরে মসজিদের সামনে একজন একজন করে অনেক ফকিরকে দিলে অনেক বেশি সওয়াব।"

সাগর অবশ্য এতো হিসেব-নিকেশের মাঝে যেতে চাইছিল না, সত্যি কথা বলতে কী কাউকে কিছু দেয়ার আগে এতো হিসেব-নিকেশ করার মাঝে এক ধরনের ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী গন্ধ পাওয়া যায়। সে আরো নিচু গলায় শাঁওলীকে বলল, "দেবে আপু?"

শাঁওলী চা ঢেলে আফতাব চাচার সামনে কাপটা রেখে বলল, "দিচ্ছি।"

কাকে দান করলে সবচেয়ে বেশি সওয়াব হয় সেটি নিয়ে আফতাব চাচা আরো একটি কথা বলতে চাইছিলেন কিন্তু তার আগেই শাঁওলী তাদের ঘরে ঢুকে গেল। আফতাব চাচা তার চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে একটা তৃপ্তির শব্দ করে কাপটা হাতে নিয়ে বাইরের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন, তিনি মাথা ন্যাড়া ছেলে এবং তার মা এবং মায়ের কোলে শিশুটি দেখে রীতিমত আঁৎকে উঠে বললেন। "এ্যাই? তুমরা হিন্দু না?"

মহিলাটি মাথা নাড়ল। দুইদিন আগেও তার কপালে সিঁদুর ছিল হাতে শাখা ছিল। স্বামী মারা যাবার পর সিঁদুর মুছে শাখা খুলে এই সাদা শাড়ি পরিয়ে দেয়া হয়েছে। আফতাব চাচা ধমক দিয়ে বললেন। "হিন্দু হয়ে মুসলমান বাড়িতে ভিক্ষা করতে আসছ? সাহস তো কম না। যাও-যাও ভাগো।"

বাচ্চা ছেলেটি আগের মতো উদাস উদাস চোখে তাকিয়ে রইল, মায়ের মুখে শুধু একটু ভয়ের ছায়া পড়ল। হিন্দু হয়ে মুসলমানের বাসায় ভিক্ষা করতে আসার অপরাধে সে ছেলের হাত ধরে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে থাকে। আফতাব চাচা দরজা বন্ধ করে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আরেকবার তৃপ্তির শব্দ করে ভেতরে এলেন। সাগর ততক্ষণে শাঁওলীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে দরজার দিকে যাচ্ছে, আফতাব চাচা তাকে থামালেন। ছোট বাচ্চারা ভুল করলে মানুষ যে রকম প্রশ্রয়ের ভাব করে তাকায় অনেকটা সেভাবে সাগরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি বুঝ নাই?"

সাগর একটু অবাক হয়ে বলল, "কী বুঝি নাই?"

"হিন্দু ফ্যামিলি?"

"কে হিন্দু ফ্যামিলি?"

" ঐ যে ভিক্ষা করতে আসছিল?"

সাগর মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

আফতাব চাচা হাসি হাসি মুখে বললেন, "দেখ নাই ছেলেটার মাথা ন্যাড়া করেছে? এরা বাপ মরলে মাথা ন্যাড়া করে। বউটা সাদা কাপড় পরেছে দেখ নাই? হিন্দু বিধবারা সাদা থান পরে।"

শাঁওলী বলল, "আহা।"

আফতাব চাচা একটু অবাক হয়ে শাঁওলীর দিকে তাকিয়ে আবার সাগরের দিকে ঘুরে বললেন, "আমি দেখেই বুঝেছি হিন্দু। হিন্দুদের ভিক্ষা দিতে হয় না—হিন্দুদের ভিক্ষা দিলে কুনু সওয়াব হয় না, খালি টাকাটা নষ্ট হয়।"

সাগর খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আফতাব চাচার দিকে তাকিয়ে রইল, কিছু একটা বলবে কী না চিন্তা করে, শেষ পর্যন্ত কিছু না বলেই আফতাব চাচাকে পাশ কাটিয়ে বাইরের ঘরের দিকে রওনা দিল। আফতাব চাচা ডেকে বললেন, "নাই-ওরা নাই। চলে গেছে।"

"চলে গেছে?" সাগর অবাক হয়ে বলল, "কেন চলে গেছে।"

আফতাব চাচা খুব বড় কিছু একটা করে ফেলেছেন সে রকম ভঙ্গি করে বললেন, "আমি বিদায় করে দিয়েছি।"

সাগর এই পরিবারের সবচেয়ে ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ সে কখনো রাগ করে না, কিন্তু হঠাৎ করে সে এখন রেগে গেল, তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে বলল, "আপনি বিদায় করে দিয়েছেন? আপনি কেন বিদায় করে দিয়েছেন?"

আফতাব চাচা সাগরের গলার স্বরে, কথার ভঙ্গিতে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন, ইতস্তত করে বললেন, "কেন, কী হয়েছে? তুমি কী হিন্দুরে ভিক্ষা দিবা?"

"হিন্দু না মুসলমান তাতে কী আসে যায়?" সাগর প্রায় কেঁদে ফেলল, বলল, "কী আসে যায়?"

শাঁওলী সাগরের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "এখনো বেশি দূর যায়নি—বাইরে গেলেই খুঁজে পাবি। যা-দৌড়ে যা।"

সাগর মাথা নেড়ে ঘর থেকে প্রায় ছুটে বের হয়ে গেল, আফতাব চাচার মুখ দেখে মনে হল তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে চায়ের কাপে আরেকটা চুমুক দিয়ে বললেন, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এই ছেলে এইরকম করছে কেন? তুমরা জান না বিধর্মীকে দান খয়রাত করলে লাভ নাই?"

শাঁওলী এক ধরনের অবিশ্বাস নিয়ে আফতাব চাচার দিকে তাকিয়ে রইল, সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না যে একজন মানুষ এরকম কথা বলতে পারে। ব্যাপারটি নিয়ে কিছু একটা বলবে কী না বুঝতে পারছিল না কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল।

কিছুক্ষণের মাঝেই সাগর ফিরে এলো, তার মুখ দেখেই শাঁওলী বুঝতে পারল সে নিশ্চয়ই পরিবারটাকে খুঁজে পেয়েছে। তবুও নিশ্চিত হবার জন্যে জিজ্ঞেস করল, "পেলি?"

"হ্যাঁ। বাসার বাইরেই দাঁড়িয়েছিল।"

"গুড।"

"ছোট বাচ্চাটা কী কিউট। দেখলেই মাড়ি বের করে হাসে।"

শাঁওলী কিছু বলল না, এখন সবাই স্কুলে যাবে, বাসার ভেতরে খানিকটা ছোটাছুটি এবং উত্তেজনা চলছে। প্রত্যেক দিনই স্কুলে যাবার সময় হলে কারো না কারো কিছু না কিছু

খুঁজে পাওয়া যায় না এবং তখন একজন আরেকজনকে সে জন্যে দোষ দিতে থাকে। আজকেও মোটামুটি সেই পর্যায়টি চলে এসেছে বন্যা আর সুমন একটা রুলার নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করছে। সাগর তার মাঝে শার্ট পরতে পরতে বলল, "বাবাটা একসিডেন্ট করে মারা গেছে। বাসে করে আসছিল ট্রাকের সাথে ধাক্কা লেগেছে।"

শাঁওলী বলল, "আহা রে।"

সাগর বলল, "বউটা বলছিল যে খুব নাকি ভাল মানুষ ছিল।"

আফতাব চাচা একটু শব্দ করে হাসলেন, হেসে বললেন, "ভাল হলেই আর কী লাভ— বেহেশতে তো যেতে পারবে না।"

শাঁওলী অবাক হয়ে বলল, "কী বললেন চাচা? কে বেহেশতে যেতে পারবে না?"

"ঐ হিন্দু লুকটা।"

"বেহেশতে যেতে পারবে না?"

"না।" আফতাব চাচা মাথা নেড়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "মুসলমান ছাড়া আর কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না।"

আফতাব চাচার কথা শুনে বন্যা আর সুমনও তাদের রুলার নিয়ে ঝগড়া বন্ধ করে এগিয়ে এলো। সাগর বলল, "মুসলমান ছাড়া আর কেউ বেহেশতে যাবে না?"

"না।"

"মাদার তেরেসা? মহাত্মা গান্ধী?"

"উঁহু।"

সুমন একটু এগিয়ে এলো, "আইনস্টাইন?"

আইনস্টাইন মানুষটা কে আফতাব চাচা ঠিক চিনতে পারলেন বলে মনে হলো না কিন্তু তারপরও তার রায় দিতে দেরি হল না। মাথা নেড়ে বললেন, "যাবে না। মুসলমান না হলে কেউ বেহেশতে যাবে না।"

স্কুলে যেতে দেরি হয়েছে জেনেও সবাই বিস্ফারিত চোখে আফতাব চাচাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। আফতাব চাচা সোজা হয়ে বসে মাথা উঁচু করে বললেন, "এই জন্যে হিন্দুদের কোন দান-খয়রাত করতে হয় না। মায়া মহব্বত করতে হয় না।"

বন্যা উঁচু গলায় বলল, "তার মানে মুসলমান ছাড়া আর সবাই খারাপ?"

আফতাব চাচা সরাসরি কিছু বললেন না কিন্তু মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিলেন। বন্যা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, "আমাদের সুপ্রিয় স্যার খারাপ? দুনিয়ার মাঝে সবচেয়ে ভাল মানুষ—"

শাঁওলী হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলল, "যা-যা স্কুলে যা।"

"আপু-তুমি শুনছ না চাচা কী বলছেন?"

"চাচা যেটা জানেন সেটা বলছেন—তুই যেটা জানিস সেটা বলবি, তাতে সমস্যা কী?

"কিন্তু—"

"কোন কিন্তু না। যা স্কুলে যা।"

সুমন ব্যাগ ঘাড়ে তুলতে তুলতে তেড়িয়া হয়ে বলল, "তাহলে এই পৃথিবীতে হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ কেউ থাকবে না? শুধু মুসলমান থাকবে?"

"ঈমান আনলে মুসলমান হলে সবাই থাকতে পারে।"

সাগর বলল, "অন্য ধর্মের মানুষ কেন তার ধর্ম পাল্টাবে? আপনি আপনার ধর্ম পাল্টাবেন?"

"আমি?" আফতাব চাচা রীতিমত চমকে উঠে বললেন, "আমি কেন আমার ধর্ম পাল্টাব? নাউজুবিল্লাহ্ আমার ধর্ম হচ্ছে আল্লাহ্র ধর্ম—"

"যারা হিন্দু তাদের কাছে তাদের ধর্ম আল্লাহ্র ধর্ম। যারা—"

শাঁওলী আবার হাত তুলে ধমক দিল, "ব্যাস অনেক হয়েছে। এখন বাসার ভিতরে ওয়াজ মাহ্ফিল শুরু করতে হবে না। স্কুলে যা—"

সুমন তার চশমার ভেতর থেকে ক্রুদ্ধ দুটি চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, "আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হচ্ছে সলীল, তাকে আমি ধাক্কা মেরে ফেলে দিব?"

আফতাব চাচা মাথা নেড়ে বললেন, "বিধর্মী কাফেরদের সাথে মেলামেশা করা ঠিক না।" তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "সব আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ্র যদি আসলেই ইচ্ছা থাকতো তাহলে তো সবাইকেই মুসলমান বানাতেই পারতেন। যেই কারণে মুসলমান হিসেবে জন্ম দেন নাই, হিন্দু ঘরে জন্ম দিছেন, খিরিস্টান ঘরে জন্ম দিছেন—তার মানে আল্লাহই তাদের নাজায়েৎ করে দিয়েছেন।"

"তাদের সাথে মিশলে গুনাহ হবে?"

"কিছু তো হবেই। না মিশাই ভাল।"

সুমন আবার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল শাঁওলী সুযোগ দিল না, ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিল। সবাই রাগে গরগর করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আফতাব চাচা ছেলেমেয়েদের ব্যবহারে খুব বিরক্ত হয়েছেন বলে মনে হলো, খাবার টেবিলে বসে গজগজ করতে লাগলেন। শাঁওলী সামনে থেকে সরে এলো এরকম একটা বিষাক্ত মানুষের কাছাকাছি থাকা ঠিক নয়। ইউনিভার্সিটির অনেক ক্লাস কামাই হয়েছে—এখন মাঝে মাঝে সে ক্লাসে যেতে শুরু করেছে, সামনে পরীক্ষা, পড়াশোনা শুরু করে দিতে হবে। ঝুমুর এখনো ঘুমাচ্ছে—সে ওঠার আগে একটা চ্যাপ্টার শেষ করে নেয়া দরকার, ক্লাশ নোটটা হাতে নিয়েও সে অনেকক্ষণ পড়ায় মন বসাতে পারল না— আফতাব চাচার মতো মানুষদের মাথার ভেতরটা কেমন একবার খুলে দেখতে পারলে হতো।

শওকত যদিও দাবি করেছিল যে আফতাব চাচা তার ছেলে মেয়েদের দেখতে এসেছেন কিন্তু সন্ধ্যেবেলা বোঝাগেল তার কথাটি পুরোপুরি সত্যি নয়। আফতাব চাচার নানারকম অসুখ-বিসুখ আছে, তিনি তার চিকিৎসা করাতে এসেছেন। সন্ধ্যেবেলা তিনি চকচকে একটা চশমা পরে হাসি হাসি মুখে বসে রইলেন এবং একটু পরে পরে বলতে লাগলেন, "আল্লাহর দুনিয়াটা কী সুন্দর, এতদিন টের পাই নাই।"

শাঁওলী জিজ্ঞেস করল, "কেন টের পান নাই?"

"চুখে চশমা ছিল না, সবকিছু ঝাপসা ঝাপসা লাগত। এখন সবকিছু ফকফকা ঝকঝকা। জার্মানির ফ্রেম। বেলজিয়াম কাচ। একেবারে এক নম্বুরি জিনিস।"

আফতাব চাচা মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন এবং মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। শাঁওলী ভদ্রতা করে আলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে জিজ্ঞেস করল, "কোন ডাক্তারকে দেখিয়েছিলেন?"

"নাম জানি না।" আফতাব চাচা পকেট থেকে কাগজপত্র প্রেসক্রিপশান বের করতে করতে বললেন, "এই যে চশমার কাগজ। তুমার আব্বার পরিচিত ডাক্তার, খুব খাতিরযত্ন করল। খুব ভাল ডাক্তার। ফাস ক্লাস।"

শাঁওলী চশমার প্রেসক্রিপশানটি দেখে নিজের অজান্তে হেসে ফেলল। সুমন কাছেই দাঁড়িয়েছিল, শাঁওলীকে হাসতে দেখে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে আপু?"

"আব্বু একটা মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছে।"

"কী ভুল করেছে?"

"আফতাব চাচাকে হিন্দু ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে। ডাক্তারের নাম ডক্টর নন্দী।"

সবাই হি হি করে হেসে ফেলল। বন্যা জিজ্ঞেস করল, "হিন্দু ডাক্তারের চশমা চোখে দিয়েছেন— আপনার গুনাহ হচ্ছে না?"

আফতাব চাচা আমতা আমতা করে কী একটা বলার চেষ্টা করলেন ঠিক বোঝা গেল না। শাঁওলী বলল, "নিশ্চয়ই হচ্ছে।"

সাগর এমনিতেই বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, কী কারণে আজ সে চড়া মেজাজে ছিল, একটু গরম হয়ে বলল, "আফতাব চাচাকে গুনাহ করতে দেয়া যাবে না।"

শাঁওলী জানতে চাইল, "কী করবি?"

সাগর কিছু না বলে হঠাৎ করে ছো মেরে আফতাব চাচার নাকের ডগা থেকে চশমাটা নিয়ে কেউ কিছু বলার আগে রান্নাঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আফতাব চাচা থতমত খেয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু তার আগেই সাগর আবার ফিরে এলো, তার হাতে একটা হাতুড়ি। শাঁওলী চোখ পাকিয়ে বলল, "কী করছিস সাগর?"

"আফতাব চাচার যেন গুনাহ না হয় সেই ব্যবস্থা করছি—" বলে চশমটা টেবিলে রেখে হাতুড়ি দিয়ে এক আঘাতে কাঁচ ফ্রেম সবকিছু গুঁড়ো করে ফেলল। সাগরের মতো চুপচাপ মানুষ যে এরকম একটা কাজ করে ফেলতে পারে কেউ বিশ্বাসই করতে পারল না। খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল তারপর হঠাৎ বন্যা হি হি করে হাসতে শুরু করল।

সাগর চশমটা আফতাব চাচার হাতে দিয়ে বলল, "নেন। এখন আর গুনাহ হবে না। হিন্দু মানুষের সাথে মিশলে যদি গুনাহ হয় তাদের চিকিৎসা নিলে ডাবল গুনাহ।"

আফতাব চাচা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার গুঁড়ো হয়ে যাওয়া চশমা এবং তাকে ঘিরে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন, খানিকক্ষণ পর ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন, "চ-চ চশমটা তো কুনু দুষ করে নাই।"

"করেছে।" সাগর কঠিন গলায় বলল, "জার্মান ফ্রেম বেলজিয়াম কাচ দুটোই খ্রিষ্টান দেশ। বিধর্মী দেশের জিনিস-বিধর্মী মানুষের তৈরি।"

আফতাব চাচা হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন, সবাই দেখল তার হাত অল্প অল্প কাঁপছে। ভিতরে ভিতরে ভয়ঙ্কর রেগে উঠেছেন কিন্তু কিছু বলার মতো খুঁজে পাচ্ছেন না। সাগর তাকে সাহায্য করল, বলল, "সকালে গিয়ে একটা মুসলমান ডাক্তারকে দিয়ে চোখ পরীক্ষা করাবেন তারপরে চশমার দোকানে দোকানে খুঁজতে থাকবেন সউদি আরবে তৈরি চশমার জন্য।"

সুমন মাথা নাড়ল, বলল, "লাভ নেই ভাইয়া।"

"কেন?"

"চশমার লেন্সের সূত্র যে আবিষ্কার করেছে সে কী মুসলমান?"

"তাই তো!" সাগর চোখ বড় বড় করে বলল, "তার মানে চশমা পরলেই আপনার গুনাহ হবে।"

বন্যা মাথা নেড়ে বলল, "তাহলে তো আফতাব চাচার লাইট জ্বালালেও গুনাহ্। লাইট বাল্ব আবিষ্কার করেছে টমাস আলভা এডিসন খ্রিস্টান।"

"ঠিকই বলেছিস।" সাগর উজ্জ্বল মুখে বলল, "তাড়াতাড়ি লাইট নিভিয়ে দে। যতক্ষণ এই আলোতে দেখবেন ততক্ষণ আফতাব চাচার গুনাহ হবে।"

বন্যা বাধ্য মেয়ের মতো লাইট নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিল।

ঝুমুর এতক্ষণ চুপচাপ একটু কৌতূহল নিয়ে পুরো ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল এখন সে একটু ভয় পাওয়া গলায় বলল, "লাইট কেন নিভিয়েছ বন্যা আপু? লাইট জ্বালাও—"

শাঁওলী ধমক দিয়ে বলল, "ঢং করবি না তোরা, লাইট জ্বালা।"

"ঢং করছি কে বলল? চাচা যেটা বলেছেন সেটাই করছি। তাই না চাচা?"

আফতাব চাচা অন্ধকারে কেমন জানি একটা শব্দ করলেন— তার ঠিক কী অর্থ কেউ বুঝতে পারল না। শাঁওলী বলল, "ঠিক আছে বাপু—তোর চাচার না হয় গুনাহ্ হয়— আমাদের তো গুনাহ্ হয় না। আমরা কেন অন্ধকারে বসে থাকব?"

"দাঁড়াও আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে," সুমন উত্তেজিত গলায় বলল, "চাচাকে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিই। চাচা তার ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে থাকলেই হবে। মোমবাতির আলো নিশ্চয়ই হালাল। তাই না চাচা?"

"কিন্তু ফ্যান চালাবেন না।" সাগর বলল, "এইটা চাইনিজ ফ্যান!"

"আপনি টেলিফোনেও কথা বলতে পারবেন না। কারণ টেলিফোন আবিষ্কার করেছে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল। আরেকজন খ্রিস্টান।"

বন্যা বলল, "অসুখ হলে ওষুধও খেতে পারবেন না। পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং।"

"আপনার সবচেয়ে কষ্ট হবে কিশোরগঞ্জে ফিরে যেতে!" সাগরের গলার আনন্দটা লুকিয়ে রাখতে পারল না, বলল, "ট্রেনের ইঞ্জিনও আবিষ্কার করেছে বিধর্মী। আপনাকে পুরো রাস্তা হেঁটে যেতে হবে।"

"কিংবা গরুর গাড়িতে।"

শাঁওলী বলল, "ব্যাস, অনেক হয়েছে।" সে এগিয়ে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। বলল "ভাগ সবাই এখান থেকে। ভাগ বলছি। ভাগ।"

সবাই সরে যাবার আগে আবার আফতাব চাচার দিকে তাকাল, মানুষটি জবুথবু হয়ে বসে আছে। বয়স্ক মানুষ— হঠাৎ দেখে মনে হলো বয়স আরো দশ বৎসর বেড়ে গেছে।

বসার ঘরে মেঝেতে ঢালাও বিছানা করে শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে মাঝখানে শাঁওলী তার এক পাশে বন্যা অন্য পাশে ঝুমুর। ঢালাও বিছানা দেখে সুমন আর সাগরেরও কেমন জানি লোভ লাগছে— তারাও বিছানায় এসে পা ছড়িয়ে বসেছে।

শাঁওলী একটা তাগাদা দিল, বলল, "ঘুমাতে যা অনেক রাত হয়েছে।"

"কী হয় রাত হলে?" সুমন অনুযোগ করে বলল, "কালকে তো ছুটিই।"

"ছুটি বলে সারারাত জেগে থাকবি নাকি?"

বন্যা বলল, "আপু একটা ভূতের গল্প বল না।"

"না—না—" ঝুমুর চিৎকার করে বলল, "ভূতের গল্প বলবে না।" ঝুমুরের ভূতকে খুব ভয়, সে কিছুতেই কাউকে ভূতের নাম উচ্চারণ করতে দেয় না।

"তোকে শুনতে কে বলেছে?" বন্যা ধমক দিয়ে "কানে আঙ্গুল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়।"

"না আমি ঘুমাব না।" ঝুমুর তার ঘুমে ঢুলু ঢুলু দুটি চোখ জোর করে খুলে রেখে বলল, "আমি ঘুমাব না!"

শাঁওলী ঝুমুরকে নিজের কাছে টেনে এনে বলল, "ঠিক আছে তোকে ঘুমাতে হবে না। আমার এই পাশে শুয়ে থাক।"

"ভূতের গল্প বলবে না তো?"

"না , বলব না।"

ঝুমুর তার বালিশটা নিয়ে শাঁওলীর গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ল এবং দেখতে দেখতে ঘুমে ঢলে পড়ল। তার এত দ্রুত ঘুমিয়ে যাওয়া দেখে বন্যা খিকখিক করে হেসে উঠছিল শাঁওলী ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাকে শব্দ করতে নিষেধ করল। কিছুক্ষণের মাঝেই ঝুমুরের নিয়মিত নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে থাকে— একেবারে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেছে।

বন্যা এবারে ফিসফিস করে বলল, "এখন বল আপু। একটা ভূতের গল্প বল।"

সুমন সায় দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আপু বল। অনেকদিন ভূতের গল্প শুনি না।"

শাঁওলী মাথা নেড়ে বলল, "আমি আসলে ভূতের গল্প জানি না। সবচেয়ে ভাল ভূতের গল্প জানতো আম্মু।"

শান্তার কথা মনে পড়তেই এক মুহূর্তের জন্যে সবাই কেমন জানি আনমনা হয়ে যায়, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেই—শাঁওলী মুখে জোর করে হাসি টেনে এনে বলল, "সেকেন্ড হচ্ছে আব্বু।"

"আব্বু?" বন্যা চোখ কপালে তুলে বলল, "আব্বু আবার ভূতের গল্প বলতে পারে নাকি? আব্বু জানে শুধু সিস্টেম ইনটেগ্রেশানের গল্প!"

ঠিক তখন শওকত দাঁত ব্রাশ করতে করতে বসার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, বন্যার কথা শুনে বলল, "কী বললি? আমি শুধু সিস্টেম ইনটেগ্রেশানের গল্প বলি?"

এভাবে ধরা পড়ে গিয়েও বন্যা মোটেও বিব্রত হলো না, বলল, "বলই তো! আর কোন গল্প বলেছ কোনদিন?"

"শুনতে চেয়েছিস কোন দিন?"

"ঠিক আছে শুনতে চাইছি। বল একটা ভূতের গল্প।"

শওকত চোখ কপালে তুলে বলল, "এখন এই মাঝরাতে ভূতের গল্প বলব? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোদের ? যা ঘুমাতে যা।"

শাঁওলী অনুনয়ের স্বরে বলল "বল না আব্বু। ঐ যে প্ল্যানচেটের গল্প।"

"না—না—শুনে ভয় পাবে।"

সাগর বলল, "মানুষ তো ভয় পাওয়ার জন্যেই ভূতের গল্প শুনে!"

"পরে রাতে ঘুমাতে পারবি না!"

"না পারলে নাই। বল না আব্বু।" বন্যা একটু আদুরে গলায় একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, "প্লি-ই-ই-জ।"

শওকত এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল, চিন্তা করে বলল, "ঠিক আছে! কিন্তু দেখিস ভয় পেলে আমাকে কিন্তু দোষ দিবি না।"

সবাই প্রায় একসাথে চিৎকার করে বলল, "দিব না আব্বু।"

শওকত এসে গল্প শুরু করল, তার গল্পটা হলো এরকম :

আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখন ঘুরে বেড়াতে খুব ভাল লাগত, সুযোগ পেলেই কোথাও না কোথাও চলে যেতাম। একবার কাজল নামে আমার এক বন্ধু তার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলল, আমি একেবারে এক কথায় রাজি। গ্রামটি খুলনার এক প্রত্যন্ত গ্রামে, আজকালকার মতো তখন যাতায়াতের এতো সুবিধে ছিল না। স্টিমারে বাসে রিকশা করেও নাকি পুরোটা যাওয়া যায় না কয়েক মাইল পায়ে হেঁটে যেতে হয়। বন্ধুটি কবি প্রকৃতির, নদী-চাঁদ, গাছপালা পাখির ডাক এসব মিলিয়ে সে তার গ্রামের একটি ফাটাফাটি সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে রাখল।

নির্দিষ্ট দিনে দু'জনে রওনা দিয়েছি, সারা রাত স্টিমারে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা বসে তারপর গ্রামের উঁচু-নিচু রাস্তায় ভয়ংকর এক ধরনের রিকশাভ্রমণ, সবার শেষে খেতের আল ধরে হাঁটা। সব মিলিয়ে বেশ কষ্ট কিন্তু পুরো ব্যাপারটা হলো এ্যাডভেঞ্চারের মতো—তাই যত কষ্ট, মনে হলো ততই বুঝি মজা।

কাজলের বাড়ি পৌঁছে অবশ্যি বেশ আশাভঙ্গ হলো। যে কোন একটা গ্রামের মতো—এতো কষ্ট করে এখানে না এসে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ যাবার পথে মাঝামাঝি একটা ছোট স্টেশনে নেমে গেলেই এরকম গ্রাম পাওয়া যায়। নদী চাঁদ গাছপালা পাখির ডাক সবই গ্রামের সাথে মিশে গিয়েছে আলাদা করে চোখে পড়ে না।

তবে গ্রামের মানুষজন খুব সহজ সরল—শহর থেকে 'কলেজে পড়া' দু'জন 'ছাত্র' এসেছে তাদের খাতির যত্ন করার জন্যে সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি এমন কিছু চা খাই না কিন্তু সবাই কেন জানি ধরে নিলো আমরা শহরের মানুষ ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা না খেলে আমাদের পেটের ভাত হজম হয় না। আমাদের চা খাওয়ানোর জন্যে সবাই মিলে যা একটা কাণ্ড করল সেটা আর বলার মতো নয়।

প্রথম দিনটা কাটিয়ে দ্বিতীয় দিনেই আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। সুন্দর জায়গা বললেই আমার চোখে খোলামেলা একটা জায়গায় ছবি ভেসে উঠে কিন্তু এখানে সবই কেমন যেন ঘিঞ্জি। কাজলের অবশ্যি খুব উৎসাহ, যেটাই দেখে সেটাই দেখে বলে, "কী ফ্যান্টাস্টিক! তাই না?" আমি তার মনে ব্যথা দিতে পারি না তাই মাথা নেড়ে বলি, "ঠিকই বলেছিস। ফ্যান্টাস্টিক।"

সময় কাটানোর জন্যে আমি তখন গ্রামের লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম এখানে দেখার মতো কী আছে— অনেক চিন্তা করে কয়েকজন বলল মাইল দুয়েক দূরে একটা ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। গ্রামের মানুষজনের কাছে সেটাই খুব দর্শনীয় একটা জিনিস মনে হলেও আমার কয়েক মাইল হেঁটে একটা ডীপ টিউবওয়েল দেখতে যাওয়ার কোন ইচ্ছে

করল না। আমি তাই কখনো একা কখনো কাজলকে নিয়ে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম—তখন আবিষ্কার করলাম যে জায়গাটা ভারী ইন্টারেস্টিং।

যেমন মনে করা যাক একটা বটগাছের কথা— গ্রামের শেষ মাথায় একটা বিশাল বটগাছ, এত বড়বট গাছ আমি আমার জীবনে খুব বেশি দেখিনি। গাছের মোটা কাণ্ডটার মাঝে বয়সের ছাপ, শেকড়গুলো যেভাবে মাটি আকড়ে ধরে রেখেছে যে মনে হয় এটা বুঝি গাছ নয় কোন এটা প্রাণী। আমি সেই বটগাছের নিচে বসে পাখির কিচিরমিচির ডাক শুনছি— মানুষের যে রকম গ্রাম-শহর থাকে— পাখিদেরও নিশ্চয়ই এই বটগাছটা সে রকম একটা শহর। কতো রকম পাখি আর কতো অসংখ্য পাখি যে এই গাছটায় আছে তার কোন হিসেব নেই।

এই বটগাছটার নিচে বসে থাকতে থাকতেই আমার আরেকজন ইন্টারেস্টিং মানুষের সাথে পরিচয় হল। মানুষটা বাঙালিদের তুলনায় বেশ লম্বা। গায়ের রং ফর্সা ছিল রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো লম্বা চুল আর দাড়ি। গায়ে টকটকে লাল রংয়ের একটা ফতুয়া—মানুষ যে এরকম কটকটে লাল রংয়ের একটা কাপড় পরতে পারে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। মানুষটার নাম শিবনাথ, সে এই গ্রামেই থাকে। কাজকর্ম কিছু করে বলে মনে হয় না কথাবার্তা শুনে মনে হয় একটু আধ্যাত্মিক টাইপের মানুষ কারণ কথা বলতে বলতেই অন্যমনস্ক হয়ে দূরে তাকিয়ে থাকে আর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "রক্ষা করো মা ব্রহ্মময়ী।"

শিবনাথ খুব বেশি কথা বলে না কিন্তু তার কাছে খবর পেলাম এই গ্রামের শেষে নদীর তীরে নাকি বিশাল শ্মশান ঘাট। আমার দেখার কৌতূহল হলো, শিবনাথ তখন আমাকে শ্মশানঘাটে নিয়ে গেল। গ্রামের পথ ধরে যাচ্ছি মানুষ জন আমাদের দেখে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। আমার কেমন জানি মনে হলো— সবাই একটু অবাক চোখে আমাদের দু'জনকে দেখছে। ছোট একটি বাচ্চাকে যেভাবে একটি মা ঝাপটে ধরে সরিয়ে নিয়ে গেল যে আমার মনে হলো মানুষজন যেন শিবনাথকে একটু ভয় পায়।

শিবনাথের কাছে বিশাল একটা শ্মশানঘাটের কথা শুনে যে রকম ধারণা হয়েছিল গিয়ে দেখি সে রকম কিছু নয়। নদীর তীরে একটা বাধানো ঘাট ভেঙে চুরে আছে। তার পাশে বড় একটা জায়গা সেখানে ভাঙা হাঁড়িকুড়ি, এবং আবর্জনা। খানিকটা দূরে বেশ কিছু মঠ, সেগুলোও ভেঙেচুরে যাচ্ছে। ফাঁক-ফোকর থেকে অশ্বত্থ গাছ বেরিয়ে এসেছে। জায়গাটার একটা বিশ্রী চেহারা— শ্মশানঘাটের চেহারা খুব সুন্দর হতে হবে সে রকম কোন যুক্তি অবশ্যি নেই!

শিবনাথ এতক্ষণ কথাবার্তা বলছিল শ্মশানঘাটে এসে হঠাৎ একেবারে চুপ মেরে গেল। আমার কোন কথায়ই উত্তর দেয় না। বাধানো ঘাটে পা ভাঁজ করে বসে এরকম উদাস উদাস চোখে দূরে তাকিয়ে রইল। মানুষটা ঠিক স্বাভাবিক না তাই আমি তাকে না ঘাঁটিয়ে ফিরে এলাম।

কাজলের বাড়ি ফিরে আসার পথেই দেখতে পেলাম আমাকে নিয়ে আসার জন্যে লোকজন হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছে, এতক্ষণে গ্রামে খবর ছড়িয়ে গেছে যে শিবনাথ আমাকে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটি এতো গুরুতর কেন সেটি আমি প্রথমে বুঝতে পারলাম না— তাদের সাথে কথা বলে সেটা পরিষ্কার হলো। শিবনাথ নাকি পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক-তার

অলৌকিক ক্ষমতা। মন্ত্র দিয়ে সে মানুষকে ভেড়া বানিয়ে ফেলতে পারে। চোখের দৃষ্টি দিয়ে মানুষকে পঙ্গু করে ফেলতে পারে। অমাবশ্যার রাতে তার বাড়িতে নাকি ভূত-প্রেত-পিশাচরা নেমে আসে তখন নাকি সেখানে নরবলি দেয়া হয়। শুনে আমার ভারি কৌতূহল হল। ভূতপ্রেত আমি বিশ্বাস করি না—বৈজ্ঞানিকরা চাঁদে গিয়ে চাঁদের মাটি নিয়ে এসেছে আর পৃথিবীতে যদি ভূতপ্রেত থাকত তাহলে কী এতদিনে সেটাকে একটা শিশির ভেতরে ভরে ডিসচার্জ করে কী দিয়ে তৈরি সেটা বের করে ফেলতো না? তবে মানুষকে আমার সবসময় ইন্টারেস্টিং মনে হয়। এই প্রত্যন্ত গ্রামে শিবনাথের মতো একটা মানুষ গ্রামের সবাইকে ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা করে রেখেছে—মানুষটার নিশ্চয়ই একটা বিশেষত্ব আছে। সেটা কী জানার আমার খুব কৌতূহল হলো।

সেদিন রাত্রি বেলা খাবার পর আমি কাজলকে ডেকে বললাম, "কাজল, চল এক জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি।"

"এতো রাত্রে? কোথায় যাবি?"

"রাত কোথায়? ঢাকা থাকতে এখনো আমাদের সন্ধ্যাই হতো না—এখানে বলছিস রাত?"

"কিন্তু যাবি কোথায়?"

"শিবনাথের বাড়িতে।"

কাজল অবাক হয়ে বলল, "শিবনাথের বাড়িতে? কেন?"

"মানুষটাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, একটু কথা বলে আসি।"

কাজল হাসল, হেসে বলল, "কথা বলতে চাইলে এই মাঝরাতে কেন? দিনের বেলায় গেলি না কেন?"

"সে নাকি প্রেত সাধক। প্রেত সাধকের সাথে দিনে কথা বলে লাভ কী? আর দেখছিস না দিনের বেলা কী হৈচৈ শুরু হয়ে গেল!"

কাজল তবুও ইতস্তত করতে থাকে তখন আমি একাই রওনা দিয়ে দেব বলে ভয় দেখালাম, তাতে কাজ হলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চল যাই।"

গ্রামের মানুষ খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে, কাউকে জিজ্ঞেস করে করে শিবনাথের বাড়ি খুঁজে বের করতে হলে সমস্যা হয়ে যেতো কিন্তু কাজল মোটামুটি চিনে। তার বাড়ির সামনে বড় বড় দুটো নারকেল গাছ রয়েছে অনেক দূর থেকে সেটা দেখা যায়।

অন্ধকার রাত্রে দু'জন কথা বলতে বলতে যাচ্ছি। বেশিরভাগ বাড়ি অন্ধকার, হঠাৎ হঠাৎ কোন একটা বাড়িতে একটি দুটি আলো জ্বলছে। মাঝে মাঝে কুকুর ডাকছে— তবে গ্রামের কুকুর খুব নিরীহ, ডাকাডাকি করলেও কখনো তেড়ে আসে না।

শিবনাথের বাড়ির আশপাশে কোন বাড়ি নেই, বাড়ির সামনে বড় বড় দুটি নারকেল গাছ কাজেই খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না কিন্তু মনে হলো বাড়িটা ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। চারপাশে ঝোপঝাড়—পিছনে বড় বড় গাছে জঙ্গল হয়ে আছে। এতো রাতে একজনের বাড়ি এসে তাকে ডেকে তুলতে সংকোচ হচ্ছিল কিন্তু কাজল কোন রকম দ্বিধা না করেই গলা ছেড়ে ডাকল, "শিবনাথদা বাড়ি আছেন?"

কয়েকবার ডাকাডাকি করতেই খুট করে দরজা খুলে গেল এবং শিবনাথ বের হয়ে এলো, বলল, "কে?"

"আমরা।" কাজল একটু এগিয়ে বলল, "আমি কাজল— কাজী বাড়ির কাজল। আর আমার বন্ধু, ঢাকা থেকে এসেছে।"

শিবনাথ কোন কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে উঠানে এসে দাঁড়াল তার শরীর থেকে এটা অস্বস্তিকর গন্ধ এসে ভক করে আমার নাকে লাগল। কাজল বলল, "শিবনাথদা কী ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন?"

"না। আমার ঘুমাতে দেরি হয়।"

"ও। ঘরে আলো নেই দেখে ভাবালাম ঘুমিয়ে গেছেন।"

শিবনাথ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "একটু পরেই চাঁদ উঠবে। তখন একটু আলো হবে।"

কাজল বলল, "শিবনাথদা, আমার এই বন্ধুর সাথে তো আপনার দেখা হয়েছে, সে আপনার সাথে একটু কথা বলতে এসেছে।"

শিবনাথ আবছা অন্ধকারের মাঝে কোথা থেকে টেনে একটা জলচৌকি এনে ঝেড়ে দিয়ে বলল, "বসেন।" নিজে অসংকোচে মাটিতে বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "বলেন।"

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "আপনার সাথে যখন বটগাছের নিচে দেখা হল তখন জানতাম না আপনি একজন তান্ত্রিক। শুনে একটু কৌতূহল হল, ভাবলাম আপনার সাথে কথা বলে যাই।"

শিবনাথ কোন কথা বলে চুপচাপ বসে রইল। আমি অস্বস্তিতে একটু নড়ে-চড়ে বললাম, "গ্রামের মানুষজনের কাছে শুনেছি আপনি নাকি পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক। আপনার কাছে নাকি ভূত-প্রেত-পিশাচ আসে।"

শিবনাথ এবারেও কোন কথা বলল না, মনে হলো একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল। আমি আবার বললাম, "আমি কখনো ভূত-প্রেত এই সব দেখিনি। আপনার কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাইছিলাম।"

শিবনাথ একটু নড়েচড়ে বলল, "কী জানতে চাইছিলেন?"

"এসব কী আসলেই আছে?"

অন্ধকারে দেখতে পেলাম না কিন্তু মনে হলো শিবনাথ একটু হাসল, বলল, "আপনি বিশ্বাস করেন না?"

"না।"

শিবনাথ কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইল। আমি বললাম, "কী হল? কিছু একটা বলেন।"

"দেখেন— আমি তো আর এটা প্রচার করি না। কাজেই লোকজনকে এটা বিশ্বাস করানো তো আমার দায়িত্ব না। কেউ বিশ্বাস করলে সেটা তার নিজের ব্যাপার। না করলেও সেটা তার নিজের ব্যাপার।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এটা সম্পর্কে জানেন— আমি জানি না। আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি, আপনি আমাকে জানাবেন না?"

"কিন্তু আপনি তো জিনিসটা আছে—সেইটাই বিশ্বাস করেন না। যেটা বিশ্বাস করেন না সেটা সম্পর্কে কী জানবেন? জেনে কী লাভ?"

আমি অন্ধকারের এই আধাপাগল মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলাম— সে ঠিকই বলেছে। আমি তবুও চেষ্টা করলাম, বললাম, "জিনিসটা সম্পর্কে জানি না বলেই তো বিশ্বাস করার সুযোগ পাইনি। যদি দেখতে পেতাম—"

শিবনাথ প্রায় ধমকে উঠে বলল, "আপনি দেখতে চান?" তার গলার স্বরে কিছু একটা ছিল, আমি চমকে উঠলাম। আমতা আমতা করে বললাম "হ্যাঁ মানে যদি দেখতে পেতাম—"

কাজল আমার হাত ধরে বলল, "কী বলছিস তুই? দেখতে চাস মানে? এর মাঝে দেখার কী আছে?"

কাজল ভয় পেয়েছে, সত্যি কথা বলতে কী অন্ধকার রাতে নির্জন একটা জায়গায় এভাবে বসে ভূত-প্রেত বা পিশাচ দেখার কথা চিন্তা করে আমারই কেমন জানি ভয় ভয় করতে লাগল। আমি তবুও সাহস করে বললাম, "হ্যাঁ আমি দেখতে চাই। দেখাতে পারবেন?"

শিবনাথ একটু নড়েচড়ে বসে বলল, "আপনাদের সাহস আছে?"

সাহস নিয়ে খোটা দিলে সেটা মেনে নেওয়া যায় না— আমি কঠিন গলায় বললাম, "আছে। অবশ্যি আছে।"

"ভয় পাবেন না?"

কাজল কিছু একটা বলতে চাইছিল কিন্তু আমি তাকে বলার সুযোগ দিলাম না। বললাম, "না, ভয় পাব না।"

শিবনাথ তবুও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল তারপর বলল, "ঠিক আছে। তাহলে দেখেন, দেখি আপনাদের বিশ্বাস হয় কী না।"

কাজল ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী দেখব?"

"যারা আসবে।"

"কারা আসবে?"

শিবনাথ এবারে শব্দ করে হাসল, হেসে বলল, "রাত্রে বেলা যাদের নাম নিতে হয় না।"

শিবনাথ তার ঘরের ভিতর ঢুকে গেল এবং কিছুক্ষণ পর কিছু জিনিসপত্র নিয়ে বের হয়ে এলো, অন্ধকারে দেখা যায় না তবু মনে হলো একটা করোটি, কিছু ফুল, কিছু বাসন-কোসন, বোতলে করে কিছু তরল পদার্থ, একটা দুইটা লাঠি, চাকু, গামছা এইরকম ব্যবহারি জিনিস।

শিবনাথ আমাদেরকে ডেকে বলল, "আপনারা এইখানে বসেন।"

আমরা ইতস্তত করছিলাম, শিবনাথ বলল, "মাটিতেই বসতে হবে। কোন কিছু করার নেই।"

আমরা মাটিতে আসন পেতে বসলাম, শিবনাথ হাতে একটা কাঠি তুলে নিল তারপর বিড়বিড় করে কী একটা পড়তে লাগল; পড়তে পড়তে সে কাঠি দিয়ে আমাদের ঘিরে একটা গোল দাগ দিয়ে বলল, "আপনাদের চক্র বন্ধন দিয়ে দিলাম। কিছুতেই চক্র থেকে বের হবেন না। যতক্ষণ এর ভেতরে থাকবেন ততক্ষণ আপনাদের কোন বিপদ হবে না।"

"বিপদ?" কাজল ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী বিপদ?"

"কতো রকম বিপদ হতে পারে। যারা আসবে তারা কী করবে কে বলতে পারে!"

কাজল আমার হাত চেপে ধরে বলল, "শওকত। আয় বাদ দেই বাড়ি যাই।"

আমি ফিসফিস করে বললাম "পাগল হয়েছিস? বুজরুকিটা দেখে যাই।"

"যদি সত্যি হয়?"

"ধুর! সত্যি হবে কেমন করে? তুই না কেমিস্ট্রিতে অনার্স করছিস! কখনো ভূতের কেমিক্যাল কম্পোজিশনে পড়েছিস?"

কাজল কিছু বলল না কিন্তু সে খুব স্বস্তি পেল বলে মনে হল না।

শিবনাথ আমাদের সামনে একটা জীর্ণ মাদুর পেতে সেখানে বসল। তার সামনে করোটিটি রেখে তার উপর একটা মোমবাতি জ্বেলে নেয়। মোমবাতির আলো খুব বেশি নয় কিন্তু আমার হঠাৎ করে মনে হলো বুঝি পুরো এলাকাটি আলোকিত হয়ে উঠল। শিবনাথ একটা বোতল টেনে নিয়ে ঢক ঢক করে কিছু একটা তরল খেয়ে নেয়, তরলের ঝাঁঝালো গন্ধে জায়গাটা ভরে উঠে। কাজল ফিসফিস করে বলল, "ইথাইল এলকোহল।"

"তার মানে মদ?"

"হ্যাঁ।"

শিবনাথ ছোট একটা পুঁটুলি থেকে কিছু পাউডারের মতো জিনিস বের করে আগুনের উপর ছুড়ে দিতেই সেটা কট কট শব্দ করে পুড়তে থাকে এবং অন্যরকম একটা ঝাঁঝালো গন্ধ ভেসে আসতে থাকে। শিবনাথ একটা নতুন গামছা মাথায় বেঁধে নিল তারপর আমাদের দিকে না তাকিয়েই বলল, "আমি ডাকছি। মনে রাখবেন যতই ভয় পান এই চক্র বন্ধন থেকে বের হবেন না।"

কাজল কাঁপা গলায় বলল, "ভয় পাব কেন?"

"দেখবেন—নিজেই দেখবেন।"

"আপনি তো চক্রের বাইরে আছেন— আপনার কিছু হবে না?"

"না। আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না।"

"কেন?"

"আমার শরীরের ভিতরে একটা মাদুলি আছে। শরীর কেটে ঢুকিয়ে দেয়া আছে।" শিবনাথ কনুইয়ের উপরে হাতটা স্পর্শ করে বলল, "এই যে এই খানে।"

কাজল শুকনো গলায় বলল, "ও।"

শিবনাথ দুই হাত উপরে তুলে হঠাৎ করে অনুচ্চ এবং দ্রুত গলায় কিছু একটা বলতে লাগল। শুনে মনে হয় সে বুঝি কাউকে তীব্র ভাষায় গালাগাল করছে। একটানা কথা বলে সে এক মুহূর্তের জন্যে থামল ঠিক এখন একটা দমকা হাওয়ার মতো কিছু একটা এসে মোমবাতিটি নিভিয়ে দিল। শিবনাথ চাপা গলায় বলল, "আসছে। ওরা আসছে।"

আমি কাজলের সাথে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলাম। শিবনাথ ঠিকই বলেছিল, কৃষ্ণপক্ষের রাত সত্যি সত্যি এখন চাঁদ উঠেছে, গাছপালার উপরে উঠে আসার পর জ্যোৎস্নার একটা নরম আলো ছড়িয়ে পড়ছে। শিবনাথ হাত উপরে তুলে আকাশের দিকে মুখ করে আবার বিড়বিড় করে কথা বলতে থাকে এবং হঠাৎ করে মনে হলো চারদিক কেমন জানি নীরব হয়ে গেল। ব্যাপারটি বুঝতে আমাদের একটু সময় লাগে। চারপাশে ঝিঁঝি পোকা ডাকছিল

হঠাৎ করে সব ঝিঁঝিঁ পোকা থেমে গেছে এবং নৈঃশব্দটুকু কেমন জানি ভয়ংকর মনে হতে থাকে। আমি কান পেতে থাকি, শুধু মনে হতে থাকে এক্ষুণি বুঝি কিছু একটা ঘটবে।

হঠাৎ করে উঠানের এক প্রান্ত থেকে কেন একটা প্রাণী ছুটে এলো, সোজাসুজি আমাদের দিকে ছুটে আসছে কিন্তু— শেষ মুহূর্তে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমার হৃৎপিণ্ড ধবক ধবক করতে থাকে, মনে হতে থাকে বুঝি বুক ফেটে সেটা বের হয়ে আসবে। আমি মাথা ঘুরিয়ে প্রাণীটাকে দেখার চেষ্টা করলাম, দূরে গুড়ি মেরে বসে আছে। অন্ধকারেও চোখগুলো জ্বল জ্বল করছে, দেখে মনে হয় একটা কুকুর কিন্তু সেটি সাধারণ কুকুর থেকে অনেক বড়। প্রাণীটা নিঃশব্দে আবার গুড়ি মেরে আসতে থাকে— কাছাকাছি এসে ছুটে আমাদের দিকে আসতে থাকে কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে দিক পরিবর্তন করে অন্যদিকে চলে গেল। আমরা তার ভয়ংকর হিংস্র মুখটি দেখতে পেলাম কিন্তু প্রাণীটি একটুও শব্দ করল না।

শিবনাথ উচ্চস্বরে আবার কিছু একটা বলতে থাকে এবং হঠাৎ করে আরো কিছু প্রাণী ছোটাছুটি করতে থাকে। উঠানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সেগুলো ছুটে যাচ্ছে আমাদের কাছে ছুটে আসছে কিন্তু কোন শব্দ করছে না, মনে হচ্ছে প্রাণীগুলো যেন জীবন্ত নয় যেন এগুলো নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছুটে বেড়াচ্ছে, যেন এগুলো আতংকিত হয়ে আছে যে একটু শব্দ করলেই তাদের কিছু একটা হয়ে যাবে।

শিবনাথ এবারে হাত দুটো নিচে নামিয়ে এনে তার সামনে রাখা জিনিসপত্র থেকে ছোট কৌটার মতো একটা জিনিস তুলে নেয়। একটা দড়ি দিয়ে সেটা একটা ছোট লাঠির সাথে বাঁধা। সে লাঠিটা ধরে কৌটাটা ঘুরাতে ঘুরাতে আবার বিড়বিড় করে কথা বলতে থাকে এতক্ষণ কথাগুলো ছিল তীব্র ভাষায় গালাগাল করার মতো এবারে সেটা হলো এক রকম অনুনয়ের মতো। শিবনাথ সুর করে কাতর গলায় যেন কাউকে ডাকছে।

আমি আর কাজল একজন আরেকজনের গা ঘেষে বসে অল্প অল্প কাঁপছি, চাঁদের আলোতে চোখ অভ্যস্ত হয়ে এসেছে চারপাশে সবকিছু মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। আকাশ পরিষ্কার এতটুকু মেঘের চিহ্ন নেই, শিবনাথের বাড়ির পিছনে বাঁশঝাড় গাছপালা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাঝে আমার হঠাৎ করে নূপুরের শব্দের মতো একরম শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হলো পায়ে নূপুর পরে কেউ যেন আসছে। শব্দটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং হঠাৎ করে কোথা থেকে দমকা বাতাসের ঝাপটা এসে আমাদের উড়িয়ে নিতে চায়। শিবনাথের ঘর থরথর করে কাঁপছে, বাঁশঝাড় মাথাকুটে নড়তে থাকে, ধুলো শুকনো পাতা উড়তে থাকে। বাতাসটি যেন হিম শীতল আমাদের শরীর কাঁটা দিয়ে উঠে। উঠানে ধুলো পাক খেতে থাকে। সর সর শব্দ করে শুকনো পাতা উড়তে শুরু করে। উঠানে ছুটে বেড়ানো জন্তুগুলো হঠাৎ করে মাথা নিচু করে থেমে যায়, আমরা শুনতে পাই সেগুলো কাতর শব্দ করছে। শুকনোপাতা ধুলোবালির কুণ্ডুলি পাক খেতে খেতে সরে যায় এবং হঠাৎ করে আমরা আতংকে শিউরে উঠি। আমাদের সামনে দীর্ঘ দেহের কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের মতো কিন্তু মানুষ নয়। চাঁদের আবছা আলোতে স্পষ্ট দেখা যায় না শুধু অবয়বটা বোঝা যায়। একজন মানুষের চামড়া ছিলে নিলে যেরকম দেখা যাবে অনেকটা সে রকম। ছায়ামূর্তিটা দীর্ঘ হাত নেড়ে এক পা এগিয়ে আসে, পায়ে নূপুর বাঁধা সেখান থেকে

একধরনের শব্দ হয়। ছায়ামূর্তিটির চুল উড়ছে, সেইভাবে আমাদের দিকে আরো এক পা এগিয়ে এলো। উৎকট পচা মাংসের একটা গন্ধ, আমাদের বমি হয়ে আসতে চায় কিন্তু আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকি। আমি টের পাচ্ছি কাজল থরথর করে কাঁপছে। বিড়বিড় করে কিছু একটা বলছে উপর থেকে হঠাৎ আমাদের উপর চটচটে আঠালো ক্লেদাক্ত একটা জিনিষ পড়তে লাগল কিছু বোঝার আগে হঠাৎ করে কাজল লাফ দিয়ে উঠে চিৎকার করে ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। আমি তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে আটকে রাখতে পরলাম না— শুনতে পেলাম খন খনে গলায় কে যেন হা হা করে হেসে উঠল— কাজল ছুটে যেতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল, শুনতে পেলাম কুকুর ডাকছে, দেখলাম অসংখ্য বুনো কুকুর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমি চিৎকার করে উঠলাম—

শওকত তার গল্প বলা বন্ধ করে থামল। তার সামনে রক্তশূন্য মুখে চারজন বসে আছে কেউ কিছু বলছে না। বন্যা অস্পষ্ট গলায় বলল, "তারপর?"

"তারপর আর কী!" শওকত মাথা নেড়ে বলল, "আমি নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। যখন জ্ঞান হয়েছে তখন দেখেছি শিবনাথ আমার মুখে পানির ঝাপটা দিচ্ছে।"

"আর কাজল?'

শওকত কোন কথা না বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সেটা আর না বললাম।"

"মরে গিয়েছিল?"

শওকত অন্যমনস্কভাবে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বলল, "অনেক রাত হয়েছে। ঘুমাতে যা।"

"কিন্তু কাজলের কী হয়েছিল বলবে না?"

"বলেছি তো—এখন ঘুমাতে যা।"

সুমন প্রথমে ঘোষণা করল, আজরাতে সে একা একা ঘুমাতে পারবে না। শাঁওলী জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কোথায় ঘুমাবি?"

"তোমার সাথে। এইখানে।"

সাগরও গুটি সুটি মেরে বলল, "আমিও এইখানে ঘুমাব।"

"এইখানে কোথায় ঘুমাবি?"

"এই তো চাপাচাপি করে ঘুমিয়ে যাব।"

"চাপাচাপি করে? এইখানে?"

"হ্যাঁ।"

বন্যা বলল, "আব্বু আজকে তুমিও এইখানে ঘুমিয়ে যাও। সবাই ঘুমিয়ে যাই। দুইটা মশারি টানিয়ে দিই তখন একটা গণবিছানা হয়ে যাবে!"

"হ্যাঁ আব্বু হ্যাঁ" সুমন মাথা নাড়ল, "আজকে আমরা কেউ আলাদা ঘুমাতে পারব না। অসম্ভব।"

শওকত হাসতে হাসতে বলল, "এই তোদের সাহসের নমুনা!"

"এটা সাহসের কথা না।" সাগর গম্ভীর গলায় বলল, "ভূতের গল্প শুনলে ভয় পেতে হয়। ভয় পাওয়াটাই হচ্ছে ভূতের গল্পের উদ্দেশ্য—"

শাঁওলী শওকতের দিকে তাকিয়ে বলল, "আব্বু—"

"কী?"

"সত্যি কথাটা বলে দাও। ঝামেলা চুকে যাক—"

"কোন সত্যি কথা?"

"এই যে তুমি বানিয়ে বানিয়ে গল্পটা বলেছ!"

বন্যা চোখ বড় বড় করে বলল, "বানিয়ে বলেছে?"

শাঁওলী হি হি করে হেসে বলল, "বানিয়ে নয়তো কী? আম্মুর কাছে শুনেছি না আব্বু হচ্ছে এক নম্বর আলসে মানুষ-লুতুপুতু মানুষ। সেই আব্বু চলে যাবে গ্রামে থাকার জন্যে? যেখানে হাই কমোড নেই সেখানে আব্বু যাবে?"

সবাই চোখ পাকিয়ে শওকতের দিকে তাকাল, সুমন উত্তেজিত গলায় বলল, "আব্বু! তুমি এটা বানিয়ে বানিয়ে বলেছ?"

শওকত হেসে বলল, "তোরা ভূতের গল্প শুনতে চেয়েছিস। বলিস নি তো যে গল্পটা সত্যি হতে হবে! বলেছিস?"

"কিন্তু তুমি যে বললে, তুমি নিজে দেখেছ?"

শওকত মুখ গম্ভীর করে বলল, "শুনে রাখ। ভূতের গল্প সবসময় এভাবে বলতে হয়—যেন ঘটনাটা সত্যি, যেন ঘটনাটা একেবারে নিজের চোখে দেখা। তা না হলে ভয়টা পাবি কেমন করে?"

বন্যা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তার মানে তুমি একটা গুল মেরেছ। আমি আরও ভাবলাম—"

সাগর বলল, "গুল মারলে মেরেছে। আমি তবু আলাদা ঘুমাতে পারব না।"

বড় ভাই একা থাকবে না ঘোষণা দেয়ার ফলে অন্যদের আর কোন সমস্যা থাকল না, সবাই বলল এটি বানানো গল্প হতে পারে। তারা যে ভয়টা পেয়েছে সেটা বানানো নয়, সেটা খাঁটি কাজেই আজ তারা আজ রাতে কিছুতেই একা একা ঘুমাবে না।

আনেকদিন পর ড্রয়িংরুমে মশারি টানিয়ে ফ্লোরে একটা গণবিছানা করে সবাই ঘুমাল। সত্যি কথা বলতে কী, খুব মজা হলো অনেকদিন পর।

বন্যার ঘর থেকে খালি চায়ের কাপ নিয়ে যাচ্ছিল শাঁওলী, দেখতে পেল টেবিলে বই রেখে বন্যা পড়ছে। পড়ার ভঙ্গিটি একটু অন্যরকম, শাঁওলী ঘুরে তাকালো এবং দেখল বন্যা গালে হাত দিয়ে বসে আছে এবং তার চোখ থেকে টপটপ করে পানি গাল বেয়ে পড়ছে। বন্যা শাঁওলীর দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করল এবং চোখ মুছে কিছুই হয়নি এরকম একটা ভঙ্গি করার চেষ্টা করল। শাঁওলী একটু অবাক হয়ে বন্যার দিকে তাকাল, নরম গলায় বলল, "কী হয়েছে বন্যা?"

বন্যা জোর করে হাসার চেষ্টা করে বলল, "না আপু কিছু হয়নি।"

"বল আমাকে।"

"হঠাৎ করে আম্মুর কথা মনে পড়ে গেল।" বন্যা কিছুতেই কাঁদবে না ঠিক করে রেখেও হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ফেলল। শাঁওলী কিছু না বলে বন্যার বিছানায় চুপ করে বসে বন্যাকে কাঁদতে দিল। তার নিজের চোখেও পানি এসে যাচ্ছিল কিন্তু সে ঠিক করেছে

কিছুতেই কাঁদবে না। শান্তা মারা গেছে প্রায় এক বছর হতে চলল দু'সপ্তাহ পর তার মৃত্যু দিবস। কয়দিন থেকে সবারই ঘুরে ঘুরে শান্তার কথা মনে পড়ছে কেউ সেটা অন্যকে বলছে না— আজ হঠাৎ করে বন্যা সেটা প্রকাশ করে ফেলেছে।

বন্যা কিছুতেই কান্না থামাতে পারছিল না এবং কান্নার শব্দ শুনে প্রথমে ঝুমুর এবং পরে সুমন আর সাগরও এসে ঢুকল। কাউকে বলে দিতে হল না সবাই বুঝে গেল বন্যা কেন কাঁদছে।

কান্না খুব ছোঁয়াচে একটা জিনিস এবং বন্যাকে দেখে সবার চোখেই পানি এসে যাচ্ছিল। শাঁওলী জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আম্মু যদি এখন আসতো তোদের সবাইকে যা একটা বকুনি দিতো!"

ঝুমুর সবচেয়ে ছোট এবং তার স্মৃতিটাই সবার আগে ম্লান হতে শুরু করেছে— শান্তা যে আর ফিরে আসবে না এটা সে সবার আগে গ্রহণ করেছে। সে শাঁওলীর দিকে তাকিয়ে বলল, "কেনো আপু? আম্মু কেন বকুনি দিতো?"

"আম্মু হচ্ছে পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে বেশি হাসি খুশি মানুষ! আম্মু কখনোই কিছু নিয়ে মন খারাপ করে কাঁদে না। আম্মু সবকিছু নিয়ে আনন্দ করে—"

"মরে গেলেও?"

শাঁওলী হেসে ফেলল, বলল, "প্রায় সেরকমই!"

সুমন সাবধানে তার চশমা খুলে কাচটা মুছে বলল, "মানুষ মরে গেলে আবার কেমন করে আনন্দ করে?"

"মনে নেই আম্মু কী বলেছিল?"

"কী বলেছিল?"

"আম্মু সব সময় আমাদের সাথে থাকবে।"

ঝুমুর চোখ বড় বড় করে বলল, "সব সময়?"

"হ্যাঁ সব সময়।"

"এখন আছে আম্মু আমাদের সাথে?"

শাঁওলী মাথা নেড়ে বলল, "আছে না? একশবার আছে!"

"কোথায় আছে?"

শাঁওলী হাত দিয়ে তার চারদিকে দেখিয়ে বলল, "এই তো এদিকে সেদিকে সব দিকে।"

ঝুমুর চোখ বড় বড় করে চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে ডাকল, "আম্মু!" তারপর কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে বলল, "কী হল? আম্মু কথা বলে না কেন?"

"বলেছে তো!"

"তাহলে শুনি না কেন?"

"এখন তো আম্মু আমাদের মতো না তাই আম্মু যখন উত্তর দেয় তখন আমরা কানে শুনতে পাই না। তখন সেটা শুনতে হয় অন্যভাবে। মনের ভিতর দিয়ে।"

শাঁওলীর কথা শুনে সুমন মুখ টিপে হাসল, তাই দেখে শাঁওলী একটু রেগে উঠে বলল, "তুই ভাবছিস আমি মিথ্যে কথা বলছি?"

সুমন বলল, "না, মানে বিজ্ঞান মতে—"

শাঁওলী বলল, "তোর বিজ্ঞানের খেতা পুড়ি। আমার যখনই কোন সমস্যা হয় আমি কী করি জানিস?"

"কী কর?"

"প্রথমে চোখ বন্ধ করে আম্মুকে এক চোট বকাবকি করি।"

"বকাবকি করো?" বন্যা অবাক হয়ে বলল, "আম্মুকে বকাবকি করো?"

"হ্যাঁ। আমি আম্মুকে বলি— আম্মু তুমি কেমন করে আমাদেরকে এরকম ঝামেলার মাঝে ফেলে দিয়ে চলে গেলে? তোমার কী একটুও মায়া নেই? তুমি দেখছ আমরা এখন কী গাড্ডার মাঝে পড়েছি? এখন আমি কী করব বল দেখি?"

ঠিক কী কারণ বোঝা গেল না কিন্তু শাঁওলীর চোখ পাকিয়ে কথা বলার ভঙ্গি দেখে ঝুমুর আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠল। সে শাঁওলীর হাত ধরে বলল, "তখন আম্মু কী বলে?"

"আম্মু কোন কথা বলে না, খালি মুখ টিপে হাসে! তখন আমার আরও রাগ উঠে যায়। আমি তখন বলি— আম্মু তুমি কেন হাসছ? এটা কী হাসির একটা ব্যাপার হলো? তখন আম্মু আমার কাছে এসে মাথায় হাত দিয়ে বলে, ধুর পাগলী বেটি! এতো রাগ হচ্ছিস কেন? তখন আমি বলি, রাগ হব না কেন? "তখন আম্মু আমাকে কোন একটা বুদ্ধি দেয়। ফার্স্ট ক্লাস একটা বুদ্ধি!"

ঝুমুর চোখ বড় বড় করে বলল, "আম্মুর অনেক বুদ্ধি?"

"হ্যাঁ। আম্মুর মাথা ভর্তি বুদ্ধি।"

সাগর এতক্ষণ চুপ করে ছিল হঠাৎ করে সে বলল, "আম্মু যদি সত্যি সত্যি এখন আসে তাহলে কী করবে?"

শাঁওলী বলল "প্রথমেই বন্যার কান ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলবে, কীরে গাধা তুই কাঁদিস যে?"

শুনে ঝুমুর আনন্দে খিল খিল করে হেসে বলল, "আর কী করবে?"

বন্যা বলল, "সাগর ভাইয়ার শার্ট তুলে গেঞ্জিটা দেখে নাক কুঁচকে বলবে, ছিঃ কী নোংরা?"

সাগর সত্যি সত্যি শার্ট তুলে গেঞ্জিটা দেখে বলল, "মোটেও নোংরা না—"

"তোমার কাছে কখনও কিছু নোংরা মনে হয় না।" বন্যা মুখ শক্ত করে বলল, "আম্মু তোমার গেঞ্জি দেখে বমি করে ফেলবে।"

ঝুমুর বন্যার হাত টেনে বলল, "আমাকে দেখে কী বলবে বন্যাপু? বল না—"

"তোকে দেখে? বলছি দাঁড়া—"

শান্তা হঠাৎ করে এসে গেলে ব্যাপারটা কীরকম হবে সেটা সবাই মিলে যেটা কল্পনা করল সেটা হলো এরকম :

দরজায় শব্দ হওয়ার পর শাঁওলী চিৎকার করে বল, "দরজাটা খুলে দে বন্যা।"

বন্যা বলল, "এর আগের বার আমি খুলেছি— এখন সুমন খুলবে।"

সুমন বলল, "আগেরবারের আগেরবার আমি খুলেছি।"

শাওলী রেগে গিয়ে বলল, "ঠিক আছে তোদের কারোরই খুলতে হবে না। আমি হচ্ছি এই বাসার বাবুর্চি দারোয়ান আর ঝাড়ুদার। আমি খুলছি।"

শাওলীর গলার স্বরে উত্তাপ টের পেতেই বন্যা আর সুমন দরজা খুলতে ছুটে গেল। কিন্তু তার আগেই সাগর গিয়ে দরজা খুলে ফেলেছে, আর কী আশ্চর্য দরজার বাইরে শান্তা দাঁড়িয়ে আছে। শান্তার চুলগুলো বাতাসে উড়ে এলোমেলো হয়ে গেছে, মুখে দীর্ঘভ্রমণের একটা চিহ্ন। একটা বড় হ্যান্ডব্যাগ কাঁধে ঝুলছে।

শান্তাকে দেখে তিনজন এতো জোরে চিৎকার দিয়ে উঠল যে মনে হলো বাসার সব লাইট ঠাসঠাস করে ফেটে পড়ে যাবে। শান্তা কানে আঙ্গুল দিয়ে বলল, "আস্তে আস্তে এত জোরে চিৎকার করছিস— পুলিশ এসে যাবে যে—"

সবার আগে বন্যা ছুটে গিয়ে শান্তাকে জড়িয়ে ধরল— শান্তাকে খুব কষ্ট করে তাল সামলাতে হলো— আরেকটু হলে পড়েই যেতো! শান্তা বলল, "আরে পাগলী মেয়ে আমাকে বাসার ভেতরে ঢুকতে দিবি তো!"

বন্যাকে ঠেলে শান্তা ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সবার দিকে এক নজর তাকাল, মুখে এক ধনের দুষ্টুমির হাসি। চিৎকার শুনে ঝুমুর ছুটে এসেছে কিন্তু এতোদিন পর হঠাৎ করে শান্তাকে দেখে সে কেমন যেন লজ্জা পেয়ে গেল! শান্তা চোখ বড় করে দুই হাত তুলে বলল,"আরে! এতো দেখি আমাদের ঝুমুর বেটি! ও মা! দেখো কত বড় হয়ে গেছে—"

শান্তা হাঁটু গেড়ে বসে দুই হাত প্রসারিত করতেই ঝুমুর ছুটে এসে শান্তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শান্তা ঝুমুরকে শক্ত করে বুকে চেপে ধরে তার ঘাড়ে মুখ চেপে ধরে একবার ঘ্রাণ নেয়। কতোদিন সে তার এই ছোট মেয়েটিকে এভাবে বুকে চেপে ধরেনি! শান্তা এবারে ঝুমুরকে বুক থেকে আলগা করে তার মুখের দিকে তাকাল, মাথার চুলকে ঝুঁটির মতো করে দুই পাশে উঁচু করে বেঁধে রাখা আছে, কী ফুটফুটে মন কাড়া চেহারা। শান্তা এবারে দুই হাত দিয়ে মুখটা ধরে তার গালে ধ্যাবড়া করে একটা চুমু দিল— কেউ চুমু দিলে ঝুমুরের যা খারাপ লাগে সেটা আর বলার মত নয়, সাথে সাথে সে তার ফ্রক তুলে গালটা মুছে ফেলে কিন্তু এবারে সে মুছে ফেলল না। উল্টো শান্তার গলা ধরে তার গালে শান্তার চাইতেও ধ্যাবড়া করে একটা চুমু দিল।

শান্তা ঝুমুরকে শূন্যে তুলে এবার অন্যদের দিকে তাকাল— চোখে-মুখে এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে সুমন আর সাগর দাঁড়িয়ে আছে। শান্তা হাত বাড়িয়ে খপ করে সুমনকে ধরে নিজের দিকে টেনে এনে তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকাল, "এটা কোন চশমা? আগেরটা নাকি?"

"না, আম্মু। নতুন নিয়েছি।"

"তার মানে পাওয়ার বেড়েছে?"

"বেশি না আম্মু অল্প একটু—"

"কতোবার বলেছি চোখের যত্ন নিবি, এই বয়সে বুড়ো মানুষের মতো চশমা? আমি নেই, আর সেই সুযোগে চোখের বারোটা বাজিয়ে দিলি?"

সুমন দাঁত বের করে হেসে বলল, "এই তো তুমি এসে গেছ এখন আর খারাপ হবে না।"

শান্তা সুমনের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে তার গালেও ধ্যাবড়া করে একটা চুমু দিয়ে দিল। গালে লিপস্টিক লেগে গেছে জেনেও সুমন সেটা তার সামনে মুছে ফেলল না।

বন্যা বলল, "আম্মু তুমি সাগর ভাইয়াকে দেখে কিছু বললে না?"

"বলার সুযোগটা দিলি কই?" শান্তা বড় বড় চোখে সাগরের দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা সাগর কোথায়? এটা তো দেখি মহাসাগর। তুই দেখি মুশকো জোয়ান হয়ে গেছিস।"

সাগর কিছু বলল না, লাজুক মুখে একটু হাসল। শান্তা চোখ কপালে তুলে বলল, "ও মা। তোর দেখি আবার হালকা হালকা গোঁফ গজাচ্ছে।"

শান্তার কথা শুনে সবাই হি হি করে হেসে ফেলল, শান্তা বলল, "এর মাঝে আবার হাসির কী হল?"

ঝুমুর বলল, "ভাইয়ার মোছ—"

"গোঁফ যদি রাখতে চাস মোটা গোঁফ রাখবি। বঙ্গবন্ধুর মতো না হয় আইনস্টাইনের মতো। নবাব সিরাজদ্দৌলার মতো চিকন ফিনফিনে মোছ আমি দুই চোখে দেখতে পারি না— কালকেই তোকে একটা রেজার কিনে দিতে হবে।" শান্তা সোফায় বসতে বসতে বলল, "আয় সাগর কাছে আয়—"

"আগে বলো তুমি ধরে চুমু দিবে না—"

"সেটা আমি কথা দিতে পারছি না— আগে কাছে আয়।"

সাগর কাছে আসতেই শান্তা সাগরের মাথায় পিছনের চুল ধরে নিজের কাছে টেনে আনে। সাগর বড় হয়ে গেছে এখন এভাবে মায়ের বুকের ওপর পড়ে থাকা নেহায়েৎ ছেলেমানুষী ব্যাপার, তবুও এতদিন পর শান্তার শরীরের স্পর্শ থেকে সে সরে যেতে চাইল না।

শাঁওলী সবার থেকে দূরে দাঁড়িয়েছিল, তার চোখে-মুখে অবিশ্বাস। শান্তা বলল, "কী হল শাঁওলী—তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই এখনো আমাকে চিনতেই পারছিস না!"

"আমার এখনো বিশ্বাসই হচ্ছে না আম্মু—তুমি সত্যি এসেছ?"

"বিশ্বাস না হলে কাছে এসে দেখ, ছুঁয়ে দেখ!" শাঁওলী বলল, "আম্মু আমি একটা কাজ করি— তুমি হাসবে না তো?"

"কী করবি?"

"তোমাকে সালাম করি।"

"করবি?" শান্তা মুখ টিপে হেসে বলল, "নে— কর!"

শাঁওলী এসো শান্তার পা ছুঁয়ে সালাম করতেই শান্তা তার বড় মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে তার চিবুক স্পর্শ করে তার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, "তোর অনেক কষ্ট হয়েছে, তাই না রে?"

শাঁওলীর হঠাৎ চোখে পানি এসে যায়, ধরা গলায় বলল, "হ্যাঁ আম্মু। তোমাকে ছাড়া খুব কষ্ট হয়েছে।"

"এই তো আমি এসে গিয়েছি।" শান্তা উজ্জ্বল চোখে বলল, "আর তোদের কষ্ট হবে না।"

"তুমি আর চলে যাবে না তো?"

"না রে পাগলী আর যাব না।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"এতো দূর থেকে এসেছ তুমি নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড— তাই না আম্মু?"

"না রে, আমি একটুও টায়ার্ড না।"

শাঁওলী বলল, "তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এসো— আমি তোমার জন্যে এক কাপ চা তৈরি করে আনি। আব্বু ইন্ডিয়া গিয়েছিল সেখান থেকে দার্জিলিং চা এনেছে, যা সুন্দর ফ্লেভার।"

বন্যা বলল, "আম্মু আমিও এখন চা বানাতে পারি—"

শান্তা বলল, "সে কী? তোদের না একশবার চুলোর কাছে যেতে না করেছি?"

সুমন বলল, "তুমি ছিলে না— সব আইন তখন বাতিল হয়ে গেছে।"

"দাঁড়া তোদের আইন বাতিল করা দেখাচ্ছি।"

শান্তার রাগ দেখে ঝুমুরের খুব আনন্দ হলো সে দুই হাত নাচাতে নাচাতে বলল, "বাতিল, বাতিল সব বাতিল!"

শান্তা ঝুমুরের গাল টিপে ধরে বলল, "তুইও এখন আমার বিরোধী পার্টি?"

ঝুমুর কী বুঝল কে জানে সে জোরে জোরে মাথা নাড়ল। শাঁওলী শান্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "আম্মু—"

"কী হল?"

"তুমি আরও সুন্দর হয়ে গেছ।"

শান্তা চোখ কপালে তুলে বলল, "ফাজলেমি করিস? গোসল নেই কাপড় বদলানো নেই, চুলে চিরুনি নেই—"

"তোমার কিছু লাগে না আম্মু। তোমার চেহারা এমনিতেই যা সুন্দর—"

শান্তা একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "ব্যস অনেক হয়েছে।"

বন্যা বলল, "আম্মু তোমার চেহারা এতো সুন্দর, আব্বুও হ্যান্ডসাম— কিন্তু আমার চেহারা এরকম ডাকাতের মতো হলো কেন?"

সুমন বলল, "তুমি সেটা এখনও জান না বন্যাপু? তার কারণ তোমাকে আম্মু রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছে। তাই না আম্মু?"

বন্যা ঘুষি পাকিয়ে বলল, "আরেকবার বলে দেখ ঘুষি মেরে নাক ভিতরে ঢুকিয়ে দেব।"

শান্তা চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বন্যার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই কী বলছিস তোর চেহারা সুন্দর না? আয়নার দেখিসনি কখনো?"

"আয়নার দেখেই তো বলছি। নাকটা দেখো—আর থুতনিটা দেখো।

শান্তা বন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "আলাদা আলাদা করে নাক কান থুতনি এভাবে কেউ চেহারা দেখে না। সব মিলিয়ে দেখতে হয়। মেয়েদের বয়স যখন তেরো-চৌদ্দ বছর হয় তখন হঠাৎ করে সৌন্দর্যের একটা বন্যা আসে— হঠাৎ করে শুকনো খিটখিটে মেয়েটা রূপসী হয়ে যায়। ঢলঢলে লাবণ্য—"

সুমন মাথা নাড়ল, বলল, "হরমোন থেকে হয়।"

বন্যা চোখ পাকিয়ে বলল, "তুই আবার বিজ্ঞানের কথা বলবি তো পা ভেঙে দেব—"

শান্তা বলল, "ব্যস অনেক হয়েছে।" হঠাৎ করে সে নাক কুঁচকে বলল, "কী একটা পোড়া গন্ধ আসছে?"

শাঁওলী জিব কামড়ে বলল, "সর্বনাশ! ভাত বসিয়ে ভুলে গেছি—"

সে ছুটে যায়, তার পিছু পিছু শান্তা এবং তার সাথে সবাই। শাঁওলী যখন ভাতের ডেকচি নামানোর জন্যে রান্নাঘরের তোয়ালেটা খুঁজছে তার মাঝে শান্তা নিজের আঁচল দিয়ে ধরে ডেকচিটা নামিয়ে ফেলল। ঢাকনাটা খুলে গন্ধ নিয়ে বলল, "নিচে ধরে গেছে!"

শাঁওলী বলল, "কক্ষণো হয়নি আম্মু— এই প্রথম! তুমি এতোদিন পরে এসেছ, আর দেখো!"

শান্তা ঢাকনা তুলে অন্য ডেকচিতে কী আছে পরীক্ষা করতে থাকে। অবাক হয়ে বলল, "এই সব তুই রান্না করেছিস?"

শাঁওলী লাজুক মুখে বলল, "হ্যাঁ।"

"বাবা! তুই দেখি পাকা রাঁধুনী হয়ে গেছিস। মুরগির মাংসের রংটা দেখ— কী সুন্দর। আলু দিয়েছিস তো?"

"দিয়েছি আম্মু।"

"দেখেই জিবে পানি এসে যাচ্ছে!"

ঠিক এই সময় দরজায় আবার শব্দ হল— এবং এক সাথে সবাই চিৎকার করে বলল, "আব্বু!"

শান্তাকে দেখে তাদের আব্বুর মুখের ভাব কী হবে চিন্তা করে সবার মুখে অন্য এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে। তারা দুদ্দাড় করে বাইরের ঘরে ছুটে যায় এবং হুটোপুটি করে দরজা খুলে ফেলে। সারাদিন পরিশ্রম করে শওকত ফিরে এসেছে, এক হাতে এটাচি কেস, বগলে কাগজপত্র, ছেলে মেয়েদের দেখে সে মুখে জোর করে একটু হাসি ফোটালো।

সুমন বলল "আব্বু, আজকে তোমার জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।"

"কী সারপ্রাইজ?"

"তুমি আগে চোখ বন্ধ কর।"

"চোখ বন্ধ করব?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আহ্! আব্বু, করো না প্লিজ।"

শওকত হাল ছেড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল। এবং অন্যেরা তখন তাকে টেনে ঘরের মাঝখানে নিয়ে আসে। বন্যা আর ঝুমুর রান্নাঘর থেকে শান্তাকে টেনে এনে শওকতের সামনে দাঁড় করায়। শান্তার মুখে কেমন জানি লাজুক এক ধরনের হাসি ঠিক কী করবে বুঝতে পারছে না।

ঝুমুর এবারে শওকতের হাত ধরে বলল, "এবারে চোখ খুলো আব্বু।"

শওকত চোখ খুলে শান্তাকে দেখে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "তু-তু-তুমি?"

শান্তা লজ্জা পাবার ভঙ্গি করে বলল, "হ্যাঁ। আমি।"

"তুমি—তুমি না— একসিডেন্টে—"

শান্তা হেসে বলল, "তাতে কী হয়েছে?"

"কিন্তু এটা— এটা তো অসম্ভব—"

বন্যা মাথা নেড়ে বলল, "নিজের চোখের সামনে দেখেও বলছ অসম্ভব?"

"নিশ্চয়ই অসম্ভব। নিশ্চয়ই আমি স্বপ্নে দেখছি। নিশ্চয়—"

শওকতের কথা শুনে অন্য সবাই হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল, বড়দের নিয়ে যে কী মুশকিল। পৃথিবীতে কতো অসম্ভব জিনিসই তো ঘটতে পারে। কতো অসম্ভব জিনিসই তো ঘটে।

তা না হলে মানুষ বেঁচে থাকবে কেমন করে?